لا إله إلا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৫তম বর্ষ ।। ১০ম সংখ্যা

১৫ই জমাদিউস্ সানী, ১৪১৪ হিঃ ।। ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১০ম সংখ্যা (৫৫তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ

মাওলানা মুঃ মাযহারুল হক ৪

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

জুমুআর খুতবা (সারসংক্ষেপ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী ১১

জুমুআর খুতবা (সারাংশ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ১৬

হাদীসুল মাহ্‌দী

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ) ১৯

জীবন বিধান ও আল কুরআন

ডাঃ মোঃ নূরুল আলম ২১

ইসলামে মুক্তির মাপকাঠি

মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রহঃ) ২৩

হারাম কত দিন চলবে

জনাব এম, এ, মজিদ ২৫

কবিতা ঃ ডিশ এলো

জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ২৬

একটি দাওয়াত এবং আনুষঙ্গিক কথা

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সৌজন্যে ২৭

ছোটদের পাতা

ওয়াকফে নও

মূল ঃ জনাব খুরশীদ আতা অনুবাদ ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩২

সংবাদ ৩৭

সম্পাদকীয় ঃ ৪৫

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৫তম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

৩০শে নভেম্বর, ১৯৯৩ : ৩০শে নবুওয়ত ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান-৩

৩৫। এমন এক বংশধরকে, যাহারা একে অপর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।

৩৬। (স্মরণ কর) যখন ইমরানের (৪০০) স্ত্রী বলিল, 'হে আমার প্রভু! যাহা কিছু আমার

৪০০। এই আয়াতে আলে-ইমরানের সংক্ষেপিত শব্দ হিসাবে 'ইমরান' দ্বারা মূসার পিতা ইমরানের পরিবারকে (বংশকে) বুঝাইতে পারে, যেভাবে ২:৪১ আয়াতে বনী ইসরাঈল শব্দের সংক্ষেপণ হিসাবে কেবল 'ইসরাঈল' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা এই নামটি দ্বারা মরিয়মের পিতা ইমরানকে বুঝানো হইয়াছে।

৪০১। 'মুহার্‌রার' মানে মুক্তি-প্রাপ্ত, যে সন্তানকে পার্থিব কাজ কর্ম হইতে মুক্ত করিয়া, পিতামাতা উপাসনালয়ের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেন (লেইন ও মুফ্‌রাদাত)। বনী ইসরাঈলের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যেসব সন্তানকে ধর্মশালার সেবায় উৎসর্গ করা হইত, তাহারা চির-কুমার বা চিরকুমারী থাকিত (গসপেল অব মেরী ৫:৬ এবং তফসীরে বায়ান ৩:৩৬)। এই আয়াতে মরিয়মের মাতা হান্নাকে (এনসাই বিব্) 'ইমরাআতু ইমরান, (ইমরানের স্ত্রী) বলা হইয়াছে। অন্যত্র ১৯:২৯ আয়াতে মরিয়মকে 'উখ্‌তে হারূন' (হারূনের বোন) বলা হইয়াছে। ইমরান (আম্‌রান) ছিলেন মূসা (আঃ) এবং হারূন (আঃ)-এর পিতা। মরিয়ম নামে, মূসা ও হারূনের (আঃ) একজন বোন ছিলেন। কুরআনের ভুল বাক্‌ধারা ও সাহিত্য রীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ খৃষ্টান লেখকগণ, যাহারা কুরআনকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রণীত গ্রন্থ বলিয়া মনে করে, এই ভুল ধরিয়া বেড়ায় যে, মুহাম্মদ (সাঃ) অজ্ঞানতাবশতঃ, মূসার ভগ্নী মরিয়মের সহিত যীশুর মাতা মরিয়মকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সব বলিয়া, তাহারা মনে করে যে, কুরআনে তাহারা ঐতিহাসিক ভুল তথ্য আবিস্কার

গর্ভে আছে উহাকে আমি (সংসার) মুক্ত করিয়া তোমার (ধর্মের সেবার) জন্য উৎসর্গ (৪০১) করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে ইহা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ কুরআনে বহুস্থানের লিখা হইতে দেখা যায় যে, মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এই দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়ে বহু নবী আগমন করিয়াছেন, সময়ের দিক দিয়া এই নবীর দূরত্ব ও ব্যবধান খুবই দীর্ঘ (২ঃ৮৮, ৫ঃ৪৫)। বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) যখন মুগীরাকে (রাঃ) নাজ্‌রানের খৃষ্টানদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন, তখন খৃষ্টানেরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তুমি কি কুরআনে পড় নাই যে, সেখানে মরিয়মকে হারূনের ভগ্নী বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে, অথচ তুমি আমি সবাই জানি যে, হযরত মূসার কত সুদীর্ঘ সময় পরে যীশুর জন্ম হইয়াছিল?" মুগীরা বলেন, "আমি উত্তর জানিতাম না, তাই মদীনায় ফিরিয়াই আমি ইহা রসূলে করীম (সাঃ)-এর গোচরীভূত করি"। তিনি বলিলেন, "তুমি তাহাদিগকে এই কথা বলিলেই পারিতে যে, বনী ইসরাঈলেরা প্রথা-অনুসারে তাহাদের সন্তানদের নাম হামেশাই নবীদের বা সাধুদের নামানুসারে রাখিয়া আসিয়াছে (অর্থাৎ একই নামে বহু ব্যক্তিকে পাওয়া যায়) (তিরমিযী)। প্রকৃতপক্ষে, এই বিষয়ে হাদীস রহিয়াছে যে, হান্নার স্বামী এবং সেই হিসাবে মরিয়মের পিতা ইমরান নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল ছিল যশ্‌হীম বা যশীম (জরির এবং কাসীর)। অতএব, এই 'ইমরান' (মরিয়মের পিতা), মূসা (আঃ)-এর পিতা 'ইমরান' হইতে পৃথক। শেষোক্ত ইমরানের পিতা ছিলেন কোহাথ (যাত্রা পুস্তক ৬ঃ১৮-২০)। খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থে হান্নার স্বামী অর্থাৎ মরিয়মের পিতার নাম 'যোয়চিম' বলিয়া উল্লেখিত হওয়াতে (গস্‌পেল অব বার্থ্‌ অব মেরী, এবং এনসাই, বৃট্‌ মেরী শীর্ষক) বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নাই। ইবনে জরীর ইম্‌রানের পিতা রূপে যে যশীমের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ঐ যোয়াচিম বই আর কেহ নন। খৃষ্টান সাহিত্যের ইহা এক সাধারণ রীতি যে, দাদাকে পিতার স্থলে উল্লেখ করা হয়। তাহা ছাড়াও বাইবেলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে একই ব্যক্তির দুইটি পৃথক নাম দৃষ্ট হয় যেমন গিডিওন কে বলা হয় জেরুব্বাল (বিচারক ৭ঃ১)। অতএব, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, যদি যোয়াচিম ও ইমরান একই ব্যক্তির দুই নাম হয়। তদুপরি, কেবল ব্যক্তিই নহে, বরং সময় সময় সারা পরিবারই প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষের নামে পরিচিত হইতে দেখা যায়।

বাইবেলে ইসরাঈল নামটি সময় সময় ইসরাঈল জাতির জন্য ব্যবহৃত হয় (দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ৩,৪), কেদার নামটি ইসমাঈলের বংশধর সবাইকে বুঝাইয়া থাকে (যিশাইয় ২১ঃ১৬,৪২ঃ১১)। একইভাবে, যীশুকে, দাউদের পুত্র বলা হইয়াছে। (মথি ১ঃ১) অতএব, 'ইমরায়াতু ইমরান' ইমরায়তু দ্বারা, আল-ইমরান অর্থাৎ ইমরান পরিবার বা বংশের নারী বুঝাইতেও বাধা নাই। এই ব্যাখ্যা আরো শক্তিশালী হইয়া উঠে, যখন আমরা মাত্র দুই আয়াত পূর্বে কুরআনে

আল ইমরান (ইমরানের পরিবার) শব্দগুলি ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। 'আ ল' (পরিবার) শব্দটি এখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এই জন্য যে, মাত্র অল্প আগেই ইহা একবার ব্যবহার করা হইয়াছে ; অতএব, এত কাছাকাছি ব্যবধানে আবার ব্যবহার না করিলেও অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইবে না। এখানে স্বীকৃত বিষয় হিসাবে এই কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মরিয়মের মাতা হান্না, যিনি ইয়াহ্‌ইয়ার মাতা এলিজাবেথের চাচাত বোন ছিলেন, তিনি হারূনের বংশধর ছিলেন এবং সেই সূত্রে, ইমরানেরও বংশ ছিলেন (লুক ১:৫,৩৬)। এই তফসীরের ইংরেজী বা উর্দু বৃহত্তর সংস্করণও দেখুন। 'এসেনিস'দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া মরিয়মের মাতা হান্না মরিয়মকে উপাসনালয়ের কাজে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঐ সময় এসেনিসরা সমকালীন মানুষের কাছে বড়ই সম্মানের পাত্র ছিলেন। কেননা, এসেনিস সম্প্রদায় সন্ন্যাসব্রত পালন ও স্ত্রীলোকের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র ধর্ম-সেবা ও মানব-সেবার কাজে নিজদিগকে উৎসর্গ করিতেন (এনসাই বিব, ও জিউ, এনসাই)। ইহা প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, সুসমাচারের শিক্ষা এবং এসেনিসদের শিক্ষার মধ্যে অনেক মিল রহিয়াছে। 'মুহার্‌রার' শব্দটির অর্থ হইতে ইহাও সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মরিয়মের মাতা তাহাকে উপাসনালয়ে উৎসর্গ করিবার মানত করা দ্বারা এই ইচ্ছাই পোষণ করিয়াছিলেন যে, মরিয়ম কখনও বিবাহ করিবে না এবং সন্ন্যাসিনী থাকিয়া যাজক শ্রেণীভুক্ত হইবে। আর এইজন্যই কুরআনের অন্যত্র মরিয়মকে হারূনের ভগ্নী বলা হইয়াছে, মূসার ভগ্নী বলা হয় নাই (১৯:২৯)। অথচ হযরত মূসা ও হারূন সহোদর ভাই ছিলেন, এর কারণ এই যে, মূসা (আঃ) ছিলেন ইহুদী জাতির শরীয়তের বাহক ও প্রতিষ্ঠাতা নবী, আর হারূন ছিলেন সেই শরীয়তের শিক্ষক, সেবক ও পুরোহিত, ইহুদী পৌরহিত্যের প্রথম কর্ণধার (এনসাই বিব, এনসাই বৃট, হারূন অধ্যায়)। এই হিসাবেই মরিয়ম, যিনি পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন, তিনি হারূনের ভগ্নী সাব্যস্ত হইলেন, সাধারণ সহোদরা অর্থে নহে।

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর হাদীসের অবশিষ্টাংশ)

বুদ্ধিজাত অর্থকে পরিত্যাগ করা সত্যসাধক ব্যক্তিগণের কর্তব্য। যাহারা প্রাথমিক যুগে রসূল (সাঃ)-কে মানিয়াছেন, তাঁহারা তো তাঁহার অতীত জীবনের সত্যপরায়ণতার গুণের কারণে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছেন। এখনও যদি আমরা সত্যপরায়ণ হইবার দাবী করি, তবে আমাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট উক্ত একই পন্থায় নিজেদের সত্যপরায়ণতার গুণের পরীক্ষা দিতে হইবে। আল্লাহ্‌র দরবারে কাহারও কোনও গোঁজামিল গৃহীত হইবে না।

যুগ-ইমাম মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হইবার দাবী করিবার পূর্বে সকলের নিকট সত্যবাদী ও মুত্তাকী বলিয়া স্বীকৃত ও প্রশংসিত ছিলেন। তিনি ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে খাতামুন্নাবিয়ীন, রাফ্‌ই ঈসা ইত্যাদি বিষয়াবলীর যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, উহাকে সত্য বলিয়া যাহারা গ্রহণ করে না, তাহারা রসূল (সাঃ)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করিলে রসূল (সাঃ)-এর সহিত কীরূপ আচরণ করিত, তাহা তাহাদের ভাবিয়া দেখা ঈমানী দায়িত্ব।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলের অন্তরে আত্ম জিজ্ঞাসার উপলব্ধি আনিয়া দিন আমীন।

হাদিস শরীফ

মু-মাযহারুল হক

বঙ্গানুবাদ : বুখারী শরীফে হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) হইতে পরস্পর সন্নিহিত দুইটি হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : হযরত আদী (রাঃ) বলেন—

"(و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ০

—"আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্র রেখা (রাত্রির) কৃষ্ণ রেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়।"—কুরআন মজীদের এই আয়াত নাযিল হইবার পর আমি একটি সাদা সূতা ও একটি কালো সূতা নিজের বালিশের নীচে পাশাপাশি রাখিলাম। অতঃপর ভোর রাত্রিতে অন্ধকারে উহাদের রং-এর পার্থক্য দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কিনা, তাহা জানিবার জন্য উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, রং-এর কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সকাল বেলায় রসূল (সাঃ)-এর সমীপে আমার কার্যের বিবরণ দিয়া আরয করিলাম—হে আল্লাহ্‌র রসূল! সাদা সূতা কালা সূতা হইতে পৃথক হইবার তাৎপর্য কি? উহারা কি প্রকৃতই দুইটি সূতা? রসূল (সাঃ) বলিলেন—যদি তুমি উহাদিগকে বালিশের নীচে রাখিয়া থাক, তবে তো তোমার বালিশ অনেক প্রশস্ত। না; সাদা সূতার অর্থ হইতেছে ভোরের আলোর রেখা। আর কালা সূতার অর্থ হইতেছে রাত্রির অন্ধকারের রেখা।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস হইতে আমরা কয়েকটি বিষয় জানিতে পারি :— (১) কুরআন মজীদের কোনও আয়াতের অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে কখনও কখনও সত্যসাধক সাহাবীগণও ভুল করিতেন; কিন্তু রসূল (সাঃ)-এর গোচরে আসিবার পর তাঁহাদের সে ভুলের সংশোধন হইয়া যাইত। (২) ঐশী জ্ঞান সর্বাধিক নিশ্চিত ও অভ্রান্ত জ্ঞান। সত্যসাধক ব্যক্তির বুদ্ধিজাত জ্ঞানও ভ্রান্ত হইতে পারে। সেমতাবস্থায় ঐশী জ্ঞানের আলোকে স্বীয় বুদ্ধিজাত জ্ঞানের ভ্রান্তিকে শুধরাইয়া লওয়া সত্যসাধক ব্যক্তির কর্তব্য।

কুরআন মজীদের কোনও আয়াত অথবা রসূল (সাঃ)-এর কোনও হাদীসের অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে আজও মানুষ ভুল করিতে পারে এবং ভুল করিতেছেও। এমাতাবস্থায় কোনও মহাসত্যবাদী ব্যক্তি—যাঁহার অতীত জীবন সত্যবাদিতার প্রতীক ছিল বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়াছেন—যদি দাবী করেন যে, তিনি ঐশী আদেশে জানিতে পারিয়াছেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াত বা হাদীসের যে অর্থকে সাধারণতঃ সঠিক মনে করা হয়, উহা ভ্রান্ত অর্থ, আর উহার সঠিক অর্থ—যাহা তিনি ঐশী নির্দেশে লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন—যদি ভাষাগত দিক দিয়া ভ্রান্ত না হয়, তবে উহাকে সত্য বলিয়া সানন্দে গ্রহণ করা এবং স্বীয়

(অবশিষ্টাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এতদ্ব্যতীত তওরাত (দ্বিতীয় বিবরণ)-এর ১৮ অধ্যায়ে এইরূপ একটি আয়াত মওজুদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ আখেরুজ্জামান নবীকে মানিবে না আমি তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিব। অতএব যদি কেবল তওহীদই যথেষ্ট হইবে তবে কেন এই কৈফিয়ৎ তলব করা হইবে? খোদা কি নিজের কথা ভুলিয়া যাইবেন? আমি প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআন শরীফ হইতে কয়েকটি আয়াত লিখিলাম। নতুবা কুরআন শরীফ এই জাতীয় আয়াতে ভরপুর। বস্তুতঃ কুরআন শরীফ এই জাতীয় আয়াত দ্বারাই শুরু হইয়াছে, যেমন তিনি বলেন, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

(সূরা ফাতেহা, আয়াত ৬-৭)।*

অর্থাৎ, হে আমাদের খোদা! আমাদিগকে নবী ও রসূলগণের পথে চালাও, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কার ও আশীষ দান করিয়াছ।

---

* টীকা: ইহা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, যখন মানুষ সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সৎ কর্ম সম্পাদনের দরুন খোদাতা'লার তরফ হইতে সে একটি পুরস্কার লাভ করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তিকে কেবল এই সীমা পর্যন্ত রাখা হয় না, যে সীমা পর্যন্ত সে নিজ চেষ্টায় চলে এবং নিজ চেষ্টায় অগ্রসর হয়, বরং যখন তাহার প্রচেষ্টা শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় এবং মানবীয় শক্তির কাজ শেষ হইয়া যায় তখন খোদার দয়া তাহার সত্তায় নিজের কাজ করে এবং আল্লাহ্‌র হেদায়াত তাহাকে ঐ পর্যায় পর্যন্ত জ্ঞান, সৎকর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি দান করেন, যে পর্যায় পর্যন্ত সে নিজ প্রচেষ্টায় পৌঁছিতে পারিত না; যেমন অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

(সূরা আল-আনকবূত, আয়াত ৭০)। অর্থাৎ, যে সকল লোক আমার পথে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং যাহা কিছু তাহাদের দ্বারা ও তাহাদের শক্তির দ্বারা করা সম্ভব তাহা তাহারা করে, তখন আল্লাহ্‌তা'লার দয়ার হাত তাহাদের হাত ধরে এবং যে কাজ তাহাদের দ্বারা করা সম্ভব হইত না তাহা তিনি নিজেই করিয়া দেখান।

এখন এই আয়াত, যাহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পড়া হয়, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, খোদার আধ্যাত্মিক পুরস্কার ক্ষমা ও ভালবাসা কেবলমাত্র নবী ও রসূলগণের মাধ্যমেই লাভ করা যায়, না অন্য কোন মাধ্যমে। আমি জানি না মিঞা আবদুল হাকিম খান আদৌ নামায পড়েন কি না। যদি তিনি নামায পড়িতেন তবে এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে অনবহিত থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু যখন তাহার দৃষ্টিতে তওহীদই যথেষ্ট তবে নামাযের কি প্রয়োজন? নামায তো রসূলের উপাসনার একটি পদ্ধতি। যাহার রসূলের অনুবর্তিতার কোন প্রয়োজন নাই, তাহার নামাযের কি প্রয়োজন? তাহার দৃষ্টিতে তো একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মণও নাজাতপ্রাপ্ত। সে কি নামায পড়ে? তাহার মতে এক ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করিয়াও নিজের শুষ্ক তওহীদের দরুন নাজাত পাইতে পারে * এবং এইরূপ ব্যক্তিও নাজাত পাইতে পারে, যে ইহুদী বা খৃষ্টান বা আর্য সমাজীদের মধ্যে একেশ্বরবাদী যদিও সে ইসলামের অস্বীকারকারী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দুশমন। এমতাবস্থায় তাহার এই রায়ই হইবে যে, নামায পড়া অর্থহীন এবং রোযা রাখা নিরর্থক ব্যাপার। কিন্তু একজন মোমেনের জন্য কেবল এই আয়াতই যথেষ্ট যাহা দ্বারা জানা যায় যে, আধ্যাত্মিক সম্পদের মালিক কেবল নবী ও রসূলগণ এবং প্রত্যেকে তাঁহাদের অনুবর্তিতায় অংশ লাভ করে।

অতঃপর সূরা বাকারার শুরুতে এই আয়াত আছে,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ৩—৬)।

অনুবাদ :—এই কিতাব সন্দেহ ও সংশয় হইতে পবিত্র। ইহাতে মোত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত আছে। মোত্তাকী ঐ সকল লোক, যাহারা খোদার উপর (যাঁহার সত্তা গুপ্ত হইতে গুপ্ততর) নামায কায়েম করে, নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে খোদার রাস্তায় কিছু দান করে এবং ঐ কিতাবের উপর ঈমান আনে যাহা তোমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং

টীকা। আবদুল হাকিম খানের ব্যাখ্যা হইতে মনে হয় তাহার দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগের জন্য ইহাও একটি কারণ যে, যে ব্যক্তি স্বীয় মতানুযায়ী ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ পায় নাই সে ইসলাম ত্যাগ করিয়াও নাজাত পাইতে পারে। কেননা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় নাই। কিন্তু তাহার বর্ণনা করা উচিত ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌঁছার জন্য কি পরিমাণ দলিল প্রমাণ তাহার নিকট আছে।

এতদ্ব্যতীত ঐ সকল কিতাবের উপর ঈমান আনে যাহা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল লোকই খোদার তরফ হইতে হেদায়াত-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইহারাই নাজাতপ্রাপ্ত হইবে।

হে ধর্মত্যাগী মিয়া আবদুল হাকিম উঠ! এবং চক্ষু মেলিয়া দেখ খোদাতা'লা এই সকল আয়াতে ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন এবং নাজাত পাওয়া কেবল এই বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ খোদাতা'লার কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহার উপাসনা করিবে। খোদাতা'লার কথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্ববিরোধিতা থাকিতে পারে না। অতএব, যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার সহিত নাজাতকে সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেক্ষেত্রে এই সকল আয়াতের সন্দেহাতীত দলিলকে অস্বীকার করিয়া সন্দেহের দিকে দৌড়ানো বেঈমানী। সন্দেহের দিকে ঐ সকল লোকই দৌড়ায় যাহাদের হৃদয় কপটতার ব্যাধিতে ব্যাধিগ্রস্ত।

এই সকল আয়াতে তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়টি প্রচ্ছন্ন আছে। উপরোল্লিখিত আয়াতে খোদাতা'লা বলেন, الم ذالك الكتب لاريب فيه ط هدى للمتقين অর্থাৎ ইহা ঐ সকল কিতাব যাহা খোদার জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু ইহার জ্ঞান ও বিস্মৃতি হইতে পবিত্র, সেহেতু এই কিতাব প্রত্যেক সন্দেহ ও সংশয় হইতে মুক্ত। যেহেতু খোদাতা'লার জ্ঞান মানুষের পরিপূর্ণতার জন্য নিজের মধ্যে এক পরিপূর্ণ শক্তি ধারণ করে, সেহেতু এই কিতাব মোত্তাকীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ হেদায়াত * ইহা তাহাদিগকে

টীকা: যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিতাবের চারিটি মৌলিক উপাদান পরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ কিতাবকে পরিপূর্ণ বলা যায় না। এই জন্য খোদাতা'লা এই আয়াতে কুরআন শরীফের চারিটি মৌলিক উপাদানের কথা বলিয়া দিয়াছেন। এই চারিটি মৌলিক উপাদান হইল: (১) কর্তার ব্যক্তিত্ব, (২) বস্তুর কারণ, (৩) শব্দ চয়নের কারণ, (৪) মার্গের কারণ। চারিটি উপাদানের প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে। অতএব 'আলিফ লাম' কর্তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে ইহার অর্থ انا الله اعلم অর্থাৎ আমি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি। অতএব যেহেতু খোদা এই কিতাবের কর্তা, সেইহেতু এই কিতাবের কর্তা অন্য যে কোন কর্তা হইতে শক্তিশালী এবং পরিপূর্ণ। বস্তুর কারণের পরিপূর্ণতা এর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে এই বাক্য — ذالك الكتاب অর্থাৎ ইহা ঐ কিতাব, যাহা খোদার জ্ঞান দ্বারা অস্তিত্বের পোষাক পরিধান করিয়াছে এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, খোদাতা'লার জ্ঞান সকল জ্ঞান হইতে পরিপূর্ণ। শব্দ চয়নের

(টিকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দেখুন)

ঐ পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়, যাহা মানব প্রকৃতির উন্নতির জন্য শেষ পর্যায়। খোদা এই সকল আয়াতে বলেন, মোত্তাকী সে, যে গোপন খোদার উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, নিজের ধন-সম্পদ হইতে কিছু খোদার পথে দান করে, এবং কুরআন শরীফ ও পূর্বের কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনে; সেই ব্যক্তিই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে ব্যক্তিই নাজাতপ্রাপ্ত হইবে। এই সকল আয়াত হইতে জানা গেল যে, নবী করীমের উপর ঈমান আনা ছাড়া এবং তাঁহার হেদায়াত নামায ইত্যাদি পালন না করিলে নাজাত লাভ করা যায় না। ঐ সকল লোক মিথ্যাবাদী, যাহারা নবী করীমের (সাঃ) আঁচল পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক তওহীদের নাজাত অন্বেষণ করে। কিন্তু যেস্থলে ঐ সকল লোক এইরূপ সত্য-নিষ্ঠা যে তাহারা গোপন খোদার উপর ঈমান আনে, নামায আদায় করে, রোযাও রাখ, নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে খোদার রাস্তায় কিছু দান করে, এবং কুরআন শরীফ ও পূর্বের কিতাবসমূহের উপর ঈমানও রাখে, সেস্থলে এই বলা হয় কথা هدى للمتقين অর্থাৎ তাহাদিগকে এই কিতাব হেদায়াত দিবে, ইহার অর্থ কি? তাহারা তো এই সকল আদেশ পালন করিয়া পূর্ব হইতে হেদায়াত প্রাপ্ত। অর্জিত বস্তুকে অর্জন করা একটি নিরর্থক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই আপাতঃ স্ববিরোধী বিশ্বাসের সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

ইহার উত্তর এই যে, ঈমান আনা এবং সৎ কাজ সম্পাদন করা সত্ত্বেও ঐ সকল লোক পরিপূর্ণ দৃঢ়চিত্ততা ও পরিপূর্ণ উন্নতির জন্য মুখাপেক্ষী, যাহার পথ নির্দেশনা কেবল মাত্র খোদাই করিয়া থাকেন। ইহাতে মানুষের চেষ্টা প্রচেষ্টার কোন সুযোগ নাই। দৃঢ়চিত্ততা দ্বারা এই কথা বুঝায় যে, এইরূপ ঈমান হৃদয়ে গাঁথিয়া যাইবে যেন কোন পরীক্ষার সময় পদস্খলন না হয়, এইরূপ পদ্ধতিতে ও এইরূপে সৎ কাজ সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে এই সকল কাজে স্বাদ সৃষ্টি হয় এবং পরিশ্রম ও তিক্ততার অনুভূতি না আসে এবং এই সকল কাজ ছাড়া বাঁচাই যায় না, যেন এই সকল সৎ কাজ আত্মার খাদ্য হইয়া যায়, ইহার আহারে

কারণের পরিপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে এই বাক্য— لا ريب فيه অর্থাৎ এই কিতাব সকল ভুল-ত্রুটি ও সন্দেহ-সংশয় হইতে পবিত্র। ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, যে কিতাব খোদাতা'লার জ্ঞানে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা স্বীয় সত্যতায় এবং সকল দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় এবং সন্দেহাতীত হওয়ার ক্ষেত্রে চরম ও পরম। মার্গের কারণে পরিপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। এই বাক্য— هدى للمتقين অর্থাৎ এই হেদায়াতের কিতাব কামেল মোত্তাকীগণের জন্য এবং মানুষের প্রকৃতির জন্য যতখানি অধিক হইতে অধিকতর হেদায়াত সম্ভব হইতে পারে তাহা এই কিতাবের মাধ্যমে হয়।

পরিণত হয় এবং ইহার জন্য সুমিষ্ট পানিতে পরিণত হয় এবং ইহা ছাড়া জীবিত থাকা যায় না। মোট কথা, দৃঢ়চিত্ততার ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিত, যাহা মানুষ নিজেদের চেষ্টা দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারে না, যেমন একদিক হইতে আল্লাহ্‌র খোদা আশীষ বর্ষণ করেন তেমনি অন্যদিকে খোদার তরফ হইতে এ অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততাও সৃষ্টি হইয়া যায়।

উন্নতি দ্বারা এই কথা বুঝায় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবীয় প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত ইবাদত ও ঈমান ছাড়াও ঐ অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহা কেবল খোদাতা'লার দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে। বলা বাহুল্য, খোদাতা'লার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টা ও বুদ্ধি-বিবেচনা এই সীমা পর্যন্ত পথ দেখায় যে, যে গোপন খোদার চেহারা দেখা যায় নাই তাঁহার উপর ঈমান আনিতে হইবে। শরীয়ত মানুষকে তাহার ক্ষমতার অধিক কষ্ট দিতে চাহে না। এই কারণেই শরীয়ত মানুষকে স্বীয় শক্তিতে অদৃশ্যের উপর অধিক ঈমান অর্জন করিতে বাধ্য করে না। হাঁ, সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে এই আয়াত هدى للمتقين এ ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে যে, যখন তাহারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে দৃঢ় হইয়া যাইবে এবং যাহা কিছু তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টায় করিতে পারে তাহা করিবে তখন খোদা তাহাদিগকে ঈমানের অবস্থা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিবেন এবং তাহাদের ঈমানে অন্য একটি রং সৃষ্টি করিয়া দিবেন। কুরআন শরীফের সত্যতার ইহা একটি নিদর্শন যে, যাহারা খোদার দিকে আসে তিনি তাহাদিগকে ঈমান ও সৎকাজের ঐ পর্যায় পর্যন্ত রাখিতে চাহেন না, যে পর্যায়ে তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টায় পৌঁছিয়া থাকে। কেননা যদি এইরূপই হয় তবে কিভাবে বুঝা যাইবে যে খোদা আছেন। বরং তিনি মানবীয় প্রচেষ্টার উপর নিজের তরফ হইতে একটি ফল উৎপাদন করেন, যাহাতে খোদায়ী চমক ও খোদায়ী প্রভাব থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, মানুষ খোদার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে এই গোপন খোদার উপর ঈমান আনার অধিক আর কি করিতে পারে, যাঁহার সত্তা সম্পর্কে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু সাক্ষী। কিন্তু মানুষের এই শক্তি নাই যে, সে কেবল নিজের তৎপরতায় নিজের চেষ্টায় এবং নিজের বাহু বলে ঐশী জ্যোতিঃ সম্পর্কে জ্ঞাত হইবে, ঈমানের অবস্থা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছিয়া যাইবে, এবং পর্যবেক্ষণ ও দিব্যদর্শনের অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিবে।

অনুরূপভাবে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টা ইহার চাইতে অধিক কি করিতে পারে যে, যতদূর সম্ভব পাক-পবিত্র ও বিপদ মুক্ত হইয়া নামায আদায় করিবে, নামায যেন পতিত অবস্থায় না থাকে সেই চেষ্টা করিবে, এবং ইহার যতগুলি স্তম্ভ আছে,

যেমন মর্যাদাশালী খোদার প্রশংসা স্তুতি, তওবা, ইস্‌তেগফার, দোয়া, দরূদ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগসহ আদায় করিবে। কিন্তু ইহাতো মানুষের শক্তিতে নাই যে, সে এক অসাধারণ ব্যক্তিগত ভালবাসা, বিগলিত চিত্ততা ও বিলীনতায় ভরপুর আগ্রহ ও উদ্দীপনাসহ এবং প্রত্যেক পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইয়া খোদার দরবারে উপস্থিত হওয়ার মত অবস্থা নামাযে সৃষ্টি করিবে যেমন সে খোদাকে দেখিতেছে। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যতক্ষণ নামাযে এই অবস্থা সৃষ্টি না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষতি হইতে মুক্ত নহে। এই কারণেই খোদাতা'লা বলেন, মোত্তাকী সে, যে নামাযকে দাঁড় করায় এবং ঐ বস্তুকেই দাঁড় করানো হয় যাহার পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব يقيمون الصلوٰة আয়াতের অর্থ এই যে, তাহাদের পক্ষে যতখানি সম্ভব তাহারা নামায কায়েম করার চেষ্টা করে এবং পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে তাহা করে। কিন্তু খোদাতা'লার ফযল ছাড়া মানবীয় চেষ্টা নিষ্ফল হয়। এই জন্য ঐ মেহেরবান ও দয়ালু খোদা বলেন, هدى للمتقين অর্থাৎ যতখানি সম্ভব তাকওয়ার (খোদা-ভীরুতার) পথে তাহারা নামায কায়েম করার জন্য চেষ্টা করিবে। অতঃপর যদি তাহারা আমার কালামের (কথার) উপর ঈমান আনে তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে কেবল তাহাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের উপরই ছাড়িয়া দিব না বরং আমি নিজেই তাহাদের হাত ধরিয়া সাহায্য করিব। তখন তাহাদের নামায অন্য একটি রং ধারণ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে অন্য একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহা তাহাদের ধ্যান-ধারণাও ছিল না। এই ফযল কেবল এই জন্য হইবে যে, তাহারা খোদাতা'লার কালাম কুরআন শরীফে ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের পক্ষে যতখানি সম্ভব ছিল তাঁহার (অর্থাৎ খোদার—অনুবাদক) নির্দেশ মোতাবেক সৎ কাজে মগ্ন ছিল। মোট কথা, নামায সম্পর্কে অধিক যে হেদায়াতের ওয়াদা আছে তাহা এই যে, এতখানি প্রকৃতিগত আবেগের ব্যক্তিগত ভালবাসার ও চিত্তের বিগলিত এবং খোদার সম্মুখে পরিপূর্ণ উপস্থিতির অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে মানুষের চক্ষু নিজের প্রকৃত প্রেমিককে দেখার জন্য খুলিয়া যায় এবং খোদাতা'লার স্নিগ্ধ রূপ অবলোকন করার জন্য এক অসাধারণ অবস্থার উদ্ভব হয়, যাহা আধ্যাত্মিকতার স্বাদে ভরপুর হইবে এবং জাগতিক পঙ্কিলতা এবং কথা, কাজ, শুনা ও দেখার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধরনের পাপের বিরুদ্ধে হৃদয়ে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, ان الحسنات يذهبن السيات (সূরা হূদ, আয়াত ১১৫) (অর্থঃ—নিশ্চয় উত্তম দূরীভূত করে মন্দ কর্মকে—অনুবাদক)

(ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমুআর খুতবা

[১২ই নভেম্বর, ১৯৯৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লণ্ডনে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ]

(সার সংক্ষেপ)

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

হুযুর (আইঃ) তাশাহ্হুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর সূরা সূরা আর্‌রা'দের নিম্নলিখিত ২৯ ও ৩০ নং আয়াত পাঠ করেন :

الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ط الا بذكر الله تطمئن القلوب ٥
الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب ٥

অর্থাৎ যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে ; (তাদেরকে জেনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে থাকে। যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে—তাদের জন্য সুখ-শান্তি এবং প্রত্যাবর্তনের উত্তম স্থান নির্ধারিত আছে।

অতঃপর হুযূর বলেন, হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ আলায়হেস্‌সালাতো ওয়াস সালাম এর শিক্ষার আলোতে আমি গত কয়েকটি জুমুআর খুতবাতে 'তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্‌' (দুনিয়ার চাকচিক্য ও মায়া মোহ পরিহার করে খোদামুখী হওয়া) এর উপর আলোকপাত করেছিলাম। তাবাত্তুলের পরে এখন যিক্‌রুল্লাহ (আল্লাহ্‌র স্মরণ)-এর উপর কিছু আলোকপাত করব, কারণ তাবত্তুলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যিকরুল্লাহ্‌র সম্পর্ক রয়েছে ; বস্তুতঃ তাবাত্তুল অবলম্বন করার উদ্দেশই হল আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা ; অতএব তাবত্তুলের মধ্যে যিকরুল্লাহ্‌র এবং যিকরুল্লাহ্‌র মধ্যে তাবাত্তুলের ভাবমূর্তি রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহেস সানী (রাঃ) সালানা জলসায় যিকরুল্লাহর উপর অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেছেন যা যিকরে ইলাহীর নামে বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়াও তিনি নিজ খেলাফতকালে যা ৫২ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল বিভিন্নভাবে যিকরুল্লাহর উপর জোর দিয়েছে। ৫২ বৎসরের এ দীর্ঘকালে যারা জন্ম নিয়েছেন তারা আতফাল হয়েছে, আতফাল থেকে খুদ্দাম এবং খুদ্দাম থেকে আনসার হয়েছেন, সুতরাং এ তিন শ্রেণীই তাঁর উক্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাসমূহের দ্বারা অনেক উপকৃত ও তরবীয়তপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং যিকরুল্লাহর পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত এবং এ বিষয়ের উপর প্রকাশিত বইটি বারংবার প্রকাশ করা উচিত এবং জামা'তের বন্ধুগণকে উহা বেশী বেশী পড়া উচিত। আমি ঐ

বিষয়টিই অন্য ভঙ্গিতে ব্যক্ত করতে চাই। অবশ্য এস্থলে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিন্তু যেখানে যেখানে পুনরাবৃত্তি ঘটবে আপনারা সেখানে পূর্বাপর চিন্তা করলে দেখতে পাবেন যে, একটি নূতন বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। বিষয়টির উপর যখন চিন্তা করলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, বিষয়টির ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত। ইহার উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করতে গেলেও সম্ভবতঃ ছয় সাত খুতবায় আলোকপাত করতে হবে। যা হউক, এ বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে বিভিন্ন স্থান ও দেশে অনুষ্ঠিতব্য ইজতেমা ও জলসা সম্পর্কে কিছু ঘোষণা করতে চাই যা এখন আমার খুতবার এক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাকিস্তানে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার শূরা অনুষ্ঠিত হবে। সদর সাহেবের ইচ্ছা যে, যেহেতু তাঁর আমলের এটাই শেষ শূরা, পরবর্তীতে তিনি মজলিস আনসারুল্লাহতে শামীল হয়ে যাবেন, তাই শূরা সম্পর্কে কিছু নসীহত করা হউক। লাজনা ইমাইল্লাহ। বিহার ও অন্ধ্র প্রদেশের সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে; তাছাড়া তাহ্‌রীকে জাদীদের নূতন বৎসর সম্পর্কেও কিছু বলতে হবে, কাজেই যিকরুল্লাহর বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে এসব বিষয়ে আমাকে কিছু বলার জন্য বলা হয়েছে। লাজনা ইমাইল্লাহর ইজতেমার মধ্যে নাসেরাতের তরবীয়তের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মা'দের কর্তব্য তারা যেন নাসেরাতদেরকেও তাহরীকে জাদীদের মধ্যে শামিল হওয়ার জন্য ভরপুর উৎসাহ দান করে তরবীয়তের দায়িত্ব পালন করেন, যাতে অল্প বয়সেই তাদের মধ্যে ইসলামের জন্য আর্থিক কুরবানী করার অভ্যাস ও উৎসাহ এবং স্পৃহা জেগে উঠে।

শূরা সম্পর্কে কুরআন হাদীসে স্পষ্ট হুকুম এসেছে। শূরার নিযাম ও ব্যবস্থাপনা বস্তুতঃ খেলাফতের একটি অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। ইসলামে শূরার নিযামকে যেভাবে গুরুত্বসহকারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে অন্য কোন ধর্মে ইহার দৃষ্টান্ত নেই। ইহার মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে উচ্চাঙ্গের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা কল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে। খলীফায়ে ওয়াক্ত যদিও সর্বাধিক বুদ্ধিমান হন তথাপি তাকে হুকুম দেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে জাতির বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে। নবী করীম (সাঃ) সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান ছিলেন এবং তিনি নূরুন আলা নূর (نور علی نور—জ্যোতির উপর জ্যোতির্ময়) ছিলেন তথাপি তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছে (৩:১৬০) وشاورهم فی الامر যে, তুমি মোমেনদের সঙ্গে পরামর্শ কর, আর ফয়সালা করবে তুমি নিজে; কিন্তু তুমি খোদার উপর আস্থা ও ভরসা রেখে ফয়সালা করবে; কারণ এর পরে আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন فاذا عزمت فتوكل على الله অর্থাৎ যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। মানুষ যা কিছুই হোক না কেন দুর্বল। দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসের উপর তার দৃষ্টি যেতে পারে না বা সকল বিষয়ে সে ওয়াকিফহাল হতে পারে না। সকল জিনিসের উপর কেবল আল্লাহ্‌র দৃষ্টি রয়েছে, তিনি সকল জিনিস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল; অতএব তাঁর উপর

ভরসা করে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে ফয়সালা হবে উহা ভুল হলেও আল্লাহ্‌তা'লা উহা শুদ্ধ করে দিবেন। যেখানে বলা হয়েছে যে, মোমেনদের সঙ্গে পরামর্শ কর, আর ফয়সালা তুমি নিজে কর, তার মর্ম এই নয় যে, ইসলামে Dictatorship (একনায়কত্ব)-স্বীকৃতি হয়েছে কারণ খলীফাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, তুমি কেবল আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ফয়সালা করবে। দ্বিতীয়তঃ খলীফা সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের পরামর্শকেই গ্রহণ করে থাকেন, ইল্লা মাশাআল্লাহ কোন কোন ক্ষেত্রে খলীফা, যিনি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে দেখেন, লক্ষ্য করেন যে, তাদের পরামর্শে ভুল রয়েছে, তখন তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে ভিন্ন ফয়সালা দান করেন। সে ফয়সালা যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে করেন তাই উহা ভুল হয় না, ভুল হলে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ভুলের উপর রাখেন না, যার ফলে জাতির ক্ষতি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা পরিষ্কার করা দরকার। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, যখন দু'টি পক্ষ (বাদী বিবাদী) আমার সম্মুখে কোন বিবাদ বিরোধ পেশ করে তখন কোন বাকপটু ও বাকচতুর কথার বলে যুক্তি দেখিয়ে আমার নিকট হতে অন্য পক্ষের অধিকার খর্ব করতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেই অধিকার হরণ ঐ ব্যক্তির জন্য কেয়ামত দিবসে আগুনের টুকরা হবে।

নবী করীম (সাঃ)-এর জীবন সাক্ষ্য বহন করে যে, তিনি কখনও কোন ভুল ফয়সালা করেননি। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ যা 'হফ্‌ক' এর ঘটনা নামে পরিচিত, শুনার সঙ্গে সঙ্গে ফয়সালা করেন নি, দোষমুক্ত বলে ঘোষণা দেননি। এ সময়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জন্য বিষয়টি যে কত মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল তা প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তি আঁচ করতে পারেন। তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রী হওয়া সম্বন্ধে নবী করীম (সাঃ) সর্বাধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন তথাপি তিনি স্বামী হয়েও তৎক্ষণাৎ তাঁকে দোষ-মুক্ত বলেন নি; বরং রাসূলুল্লাহ এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ সাহাবার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, দোয়া করেছেন। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দোষ মুক্তির আয়াত নাযেল করলেন তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে বলতে লাগলো যে, তুমি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট ক্ষমা চাও ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তো আমাকে দোষ মুক্ত করেন নি; আল্লাহ্‌-তা'লা আমাকে দোষমুক্ত করেছেন, অতএব, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। এস্থলে নবী করীম (সাঃ) আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা এবং ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে ফয়সালার জন্য পরবর্তী জগদ্বাসীর জন্য এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। মোটের উপর আল্লাহ্‌তা'লার উপর ভরসা করে ফয়সালা করলে আল্লাহ্‌ কোন দিন জাতিকে ভুলের উপর রাখেন না এবং ভুলের শাস্তি ভোগ করান না।

খেলাফতে রাশেদার ইতিহাসও সাক্ষ্য বহন করছে যে, তারা সদা সর্বদা খোদার উপর ভরসা করে ফয়সালা করেছেন, তাঁরা কোন দিন কোন ভুল ফয়সালা করেন নি। আখারীনদের মধ্যে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামা'তেও আমরা তাই দেখতে পাই। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর সময়েও দেখা গিয়েছে। মজলিসে শূরার মাধ্যমে জামা'ত অনেক অনেক কল্যাণে ভূষিত হয়েছে। তিনি সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের ফয়সালা গ্রহণ করতেন। কোন দিন তাঁর ফয়সালার মধ্যে আমরা ভুল দেখিনি, যারা তাঁর খেলাফতকাল দেখেছেন তারা এর সাক্ষী।

মোটকথা, খেলাফতের পর মজলিসে শূরার স্থান ও মকাম খেলাফতের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। খলীফা মোমেনদের সঙ্গে পরামর্শ করেন আর দোয়া করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে খোদা-ভীতির সাথে নিজে ফয়সালা করেন। আমি আমার নিজ খেলাফত কালেও শূরার অজস্র বরকতের নিদর্শন দেখেছি। সুতরাং জামা'তের সকলকে, সকল অঙ্গসংগঠনকে, তারা খুদ্দাম হউক, আনসার হউক আর আতফাল ও লাজনা হউক, তারা পাকিস্তানে হউক বা আমেরিকায় বসবাস করুক প্রত্যেক শূরার ব্যবস্থাপনার সংরক্ষণ করতে হবে এবং ইহার বরকত ও কল্যাণের দুয়ার জামা'তে সদা সর্বদা উন্মুক্ত রাখার জন্য যত্নবান থাকতে হবে।

বিহার ও অন্ধ্র প্রদেশের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতেমা প্রসঙ্গে নসীহত করতে গিয়ে আমি তাহাদের তাবাত্তুল এর বিষয়ের প্রতিই মনোযোগ আকর্ষণ করবো। মহিলাদের নসীহত ও তরবীয়তের ক্ষেত্রে আমাদিগকে বেশীর ভাগ কতক ক্ষতিকর সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং রসুম ও রেওয়াজ বর্জন করার জন্য জোর দিতে হয়, কারণ এর দ্বারা মহিলা-রাই বেশী আক্রান্ত হয়। তাই তাদিগকে সময় সময় সাবধান করার জন্য আওয়াজ উত্তোলনকারীর দরকার। ঐ সব বদরসুমের মধ্যে বেপর্দা হচ্ছে অন্যতম ক্ষতিকর রসুম। পর্দা সম্বন্ধে আমাদের মহিলারা যদিও অন্যের চাইতে অনেক আদর্শবান কিন্তু নূতন যারা আছেন তারা পর্দা সম্বন্ধে অনেক গাফেল। তারা নিজেকে মর্ডান মনে করে বুরকাকে চাদরে পরিণত করেছে, চাদরকে মাথা হতে কাঁধে নামিয়ে ফেলেছে; আর তারা এখন মনে করছে যে, একি কাঁধের উপর অযথা বোঝা: কাঁধ হতে চাদরকেও নিক্ষেপ করে ফেলে দিয়েছে। অথচ লজ্জা, শরম ও পর্দা মহিলাদের জন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অলংকার বিশেষ। পর্দার জন্য বুরকা একটি সমীচীন ব্যবস্থা। বুরকার স্থানে অবস্থানুযায়ী অবশ্য চাদরও ব্যবহার করা যায়, যেমন গ্রামে অনেক সময় পর্দানশীন মহিলাদেরকে স্বামী, পিতা বা ভাইয়ের জন্য খাবার নিয়ে মাঠে যেতে দেখা যায়। তাদের চাদরের ঘুমটা এবং চাল চলনের মধ্যে পর্দার পূর্ণ আমেজ থাকে। যেমন দু'টি মহিলা হতে একটি মহিলা তার পিতার হুকুমে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে এসেছিলেন তখন আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, تمشي على استحياء

অর্থাৎ লজ্জা জড়িত পদক্ষেপে তাঁর নিকট আসলেন। অতএব আমাদের আহমদী মহিলাদেরকে পর্দার 'রূহ'—অন্তর দিয়ে পর্দার মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করা উচিত এবং সকল অবস্থায় ঘরে বাইরে ও সোসাইটিতে পর্দার সুন্দর আদর্শ কায়েম করা উচিত। এটা অত্যধিক গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়। শাদি বিয়ের সময় যেহেতু অনেক গয়ের আহমদী মহিলাও অনুষ্ঠানে যোগদান করেন যারা পর্দার তেমন খেয়াল রাখে না, তখন কোন কোন আহমদী মহিলাও জামা'তের উন্নত চাল চলনের প্রথাকে বাদ দিয়ে তাদের রং ঢং ধারণ করতে আরম্ভ করে। তখন আহমদী পর্দানশীন মহিলাদের বা ধী-সম্পন্ন আহমদী পুরুষদিগকে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তাদিগকে এমনভাবে বুঝিয়ে দেয়া উচিত যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে ও নিজে-দের সংশোধন করে ফেলে; কারণ বলা হয়েছে যে, فذكر ان نفعت الذكرى তুমি উপদেশ করতে থাক উপদেশ অবশ্যই উপকার সাধন করে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন তুমি মন্দ কাজ হতে দেখ তখন শক্তি থাকলে সেই অনুযায়ী উহাকে বারণ কর, শক্তি না থাকলে জিহ্বা দ্বারা বারণ কর, যদি তাও না পার তাহলে উহাকে অন্তর দিয়ে বারণ কর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) 'তাবাত্তুল' এর যে বিষয় ব্যক্ত করেছেন উহারও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়ার চাকচিক্য ও জাঁকজমক এবং মায়ামোহ পরিহার করে খোদার দিকে এবং খোদার রসূলের আদর্শের দিকে ধাবিত। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে ইহার তৌফীক দান করুন। (স্যাটলাইটের মাধ্যমে শ্রুত খুতবা অবলম্বনে)

ওয়াকফে জাদীদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদার বর্ষ শেষ হবে। বর্তমান বছরের চাঁদা আদায়ের রিপোর্ট লণ্ডনস্থ ওকালতে মাল-এর নিকট ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে যাতে হুযূর আকদাস (আইঃ) ডিসেম্বর মাসের শেষ জুমুআয় সমগ্র বিশ্বের ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদার বিবরণের সাথে বাংলাদেশকে শামেল করেন। ১৯৯১ সালে উক্ত খাতে বাংলাদেশের চাঁদা আদায়ের স্থান ছিল ১২তম। আমাদের হাতে এখনও এক মাসের অধিক সময় আছে। জামাতের প্রত্যেক কর্মকর্তা প্রত্যেক সদস্য যত্নবান হয়ে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদা আদায় পক্ষ পালন পূর্বক ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকায় রিপোর্ট প্রেরণ করুন। হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে দোয়া এবং বিশ্বের রিপোর্টের সাথে যাতে শরীক থাকতে পারি সেজন্য আমরা ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে ফ্যাক্সের মাধ্যমে বাংলা-দেশ থেকে ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদা আদায়ের রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করব ইনশাল্লাহ।

উল্লেখ থাকে যে, সার্বিক প্রচেষ্টার পরও যদি কোন সদস্য ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তাদের জন্য মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতি রয়েছে যে, তারা যদি ১০ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ তারিখের তাদের ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদা পরিশোধ করে দেন তবে তারা নিয়মিত চাঁদা দাতা হিসাবে গণ্য হবেন। এখানে আরো একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, হুযূর (আইঃ) কর্তৃক ১৯৯৪ সনের নতুন বছরের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদার ওয়াদার তালিকা প্রণয়ন করে থাকসারের নিকট পাঠাবেন।

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ

জুমুআর খুতবা

[হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৯-১০-৯৩ তারিখে ফযল মসজিদ লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ]

অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

তিন মাসের জন্যে নব দীক্ষিত আহমদীগণের তরবীয়তের ব্যবস্থা ছিল তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে। এখন সব সময়ের জন্যে ইহা কার্যকর থাকবে।

এর জন্যে একটি আলাদা কেন্দ্রীয় টিম তৈরী করা দরকার যা তবলীগি কাজ ছাড়াও বিশেষ করে ঐ কাজের জন্যে নিবেদিত থাকবে।

অভ্যন্তরীণ সংগঠনসমূহের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি যে, ঐ নব দীক্ষিত আহমদীগণের তরবীয়তের ব্যাপারে আমীরগণের হাত শক্তিশালী করুন।

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সালানা জলসা এবং ইজতেমাসমূহের ব্যাপারে উল্লেখ করেন। হুযূর (আইঃ) এ পর্যায়ে খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান-এর বাৎসরিক ইজতেমার প্রসঙ্গে বলেন—এ ইজতেমা ২১-২৩শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পাকিস্তান সরকার এর অনুমতি দেয় নি। হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন—পাকিস্তানের সদর আঞ্জুমান এবং অভ্যন্তরীণ সংগঠনসমূহের এতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। যখন থেকে পাকিস্তান সরকার আমাদের সালানা জলসা আর ইজতেমাগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে তখন থেকে ঐ নিষেধাজ্ঞাসমূহের ফলশ্রুতিতে সারা দুনিয়া আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে বিশ্ব ইজতেমা আর বিশ্ব জলসার আকারে এগুলো অবলোকন করছে। এজন্যে এ কুরবানীসমূহ বিফল যায় নি। হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন—একটি সালানা জলসা বা একটি ইজতেমায় যত আহমদী সমবেত হওয়ার আশা করা যেত তাথেকে ৮/১০ গুণ অধিক আহমদী এখন এসব সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছে।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংগঠনগুলোকে এ পরামর্শ দিয়েছেন যে, যেভাবে জার্মানীর খোদ্দামগণ নিজেদের খরচে নিজেদের ইজতেমাকে সারা দুনিয়ার ইজতেমা বানিয়ে দিয়েছিলেন ঐভাবে আপনারাও চেষ্টা করুন যেন এ দিনগুলোতে আমরা এখানে আপনাদের তরফ থেকে সালানা ইজতেমা বানিয়ে দিতে থাকি আর আপনারা যেসব বক্তাদেরকে শামেল করাতে চান তাদের বক্তৃতার ভিডিও বানিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিন। কয়েকটি ভিডিও আপনাদের চলবে যা এক কেন্দ্রীয় বক্তৃতার মধ্যে সংযোজন করে দিয়ে দেব।

এভাবে আপনাদের সালানা ইজতেমা কেবল আপনাদের ইজতেমা বলেই মনে করা হবে। এভাবে এক ডেপুটি কমিশনার কি হাজার ডেপুটি কমিশনারও এ ইজতেমাকে বন্ধ করে দিতে পারবে না। অন্তর্দৃষ্টিবর্ধক স্বীয় খুতবাকে বহমান রেখে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন—এবার লণ্ডনের সালানা জলসার সময়ে আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, ৩ মাস সময় (যা অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত চলবে) নব দীক্ষিত আহমদীগণের তরবীয়তের জন্যে ওয়াক্‌ফ করুন। হুযূর বলেন—এর পূর্বে কখনও এরূপ তাহরীক করা হয় নি। আর আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও করমে এতে বিস্ময়কর সুফল প্রকাশিত হচ্ছে। সারা দুনিয়ায় প্রথমবারের মত নব দীক্ষিত আহমদীগণের তরবীয়তের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। খোদাতা'লার অনুগ্রহে এ তাহরীক অসাধারণভাবে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লার সমর্থনে এ তাহরীক আমার প্রাণে ঢেলে দেয়া হয়েছিল।

হুযূর (আইঃ) বলেন—এ কাজ আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে এখন স্থায়ীভাবে চলতে থাকবে। এজন্যে একটি কেন্দ্রীয় টিম বানানো হোক যা তবলীগি কাজ ছাড়াও বিশেষভাবে ঐ কাজের জন্যে নিবেদিত হবে। ৩ মাসের জন্যে তরবীয়তের কাজ ছিল তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে। এখন ইহা সব সময়ের জন্যে জারী থাকবে আর জামাতী ব্যবস্থাপনার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অবস্থান করবে।

হুযূর (আইঃ) বলেন—যেখানে যেখানে এ কাজ এখনও হতে পারে নি অভ্যন্তরীণ সংগঠনগুলোর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি যে, তারা তরবীয়তের বিষয়ে জামাতের হাত মজবুত করুন এবং আমীরগণের নিকট নিজেদেরকে পেশ করে দিন। আর তরবীয়তের যে অংশ আমীরগণ তাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করেন উৎসাহের সাথে আগে বেড়ে তাতে অংশ নিন। আপনাদের ইজতেমাগুলোতে অবশ্যই নব দীক্ষিত আহমদীগণকে শামেল করান। তাদের তরবীয়তের জন্যে ইহা আবশ্যকীয় যে, তাদের ওপরে কিছু দায়িত্বও চাপানো হোক। হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন—আল্লাহ্‌তা'লার সমর্থনের বায়ু লোকদেরকে আহমদীয়াতে প্রবেশ করানোর জন্যে প্রবাহিত হচ্ছে আর তাদেরকে শামলানোর জন্যে এখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি আবশ্যকীয়।

এর পরে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) তাঁর গত জুমুআর খুতবাগুলোর ধারাবাহিকতায় তাবাত্তুলের বিষয়বস্তুর ওপরে ঈমানোদ্দীপক আলোকপাত করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন—তাবাত্তুলের প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)ও বার বার বলেছেন যে, মৃত্যুকে কবুল করো, বরং জীবিত হওয়ার জন্যে মৃত্যু বরণ করো। আর যাকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) 'মৃত্যু' বলেছেন উহাই তাবাত্তুল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলতেন—তৌহীদের জ্যোতিঃ নিজস্ব পূর্ণ মর্যাদার সাথে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের মধ্যে চমকাতে পারে না যখন পর্যন্ত বাহ্যিক উপাস্যগুলো অন্তর্হিত না হয় অর্থাৎ তাবাত্তুল এর বিষয়বস্তুকে

হুযূর (আইঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এক তাবাত্তুল তৌহীদের পূর্বে আছে। তৌহীদকে অবলম্বন করতে চাও তো তাবাত্তুলের দিকে সুগভীরভাবে মনোযোগ দাও। খোদা-তা'লার খাতিরে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে হয়। এর পূর্বে তৌহীদের প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, এক তৌহীদ তাবাত্তুলের পরে প্রকাশমান হয়। ইহা এক মহান তৌহীদের চিত্র যার কোন নমুনা নেই। আবার বলেছেন, তৌহীদ একটি জ্যোতিঃ যা বাহ্যিক ও আত্মিক উপাস্যগুলো অন্তর্হিত হওয়ার পরে অন্তরে সৃষ্টি হয় আর অস্তিত্বের অণুতে অণুতে সঞ্চারিত হয়ে যায়। অতএব ঐ অস্তিত্ব খোদা ও তাঁর রসূলের মাধ্যম ব্যতিরেকে নিজের শক্তিতে কিভাবে লাভ হতে পারে? মানুষের কেবল মাত্র এই কাজ যেন সে নিজের অস্তিত্বের ওপরে মৃত্যুসম অবস্থা আনয়ন করে। এ দুনিয়ার শয়তানী দুর্বিপাককে যেন পরিত্যাগ করে। এর ফলেই তৌহীদের জ্যোতিঃ খোদার তরফ থেকে তার ওপরে অবতীর্ণ হবে এবং একটি নতুন জীবন তাকে প্রদান করা হবে। হুযূর (আইঃ) তাবাত্তুল-এর মহান বিষয়বস্তুকে বিস্তৃতির ধারায় আঁ হযরত (সাঃ)-এর হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর তত্ত্বপূর্ণ রচনাবলীকে পেশ করেছেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন, তাবাত্তুলের এ উদ্দেশ্য নয় যে, মানুষ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করুক। তাবাত্তুলের উদ্দেশ্য দুনিয়াতে অবস্থান করা এবং প্রত্যহ উহারই আস্বাদ ও মোহ দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া এবং প্রতিটি মুহূর্তে ঐ কথার ওপরে তত্ত্বাবধান করা যেন এসব আস্বাদ খোদাতা'লার সম্পর্কের মোকাবেলায় মূল্যহীন প্রতীয়মান হয়—ইহাই ঐ তাবাত্তুলের প্রাণ। অন্যথায় দুনিয়ার সৌন্দর্যসমূহ, উত্তম পোশাকাদি, খাদ্য-পানীয় মোমেনগণের জন্য হারাম নয়। এবং যেখানে খোদার আদেশ হয় সেখানে ঐ সব নেয়া-মতগুলো থেকে মোমেনগণ বেঁচে থাকে যেমন, রমযান মাসে হালাল নেয়াতগুলোকেও খোদার খাতিরে পরিত্যাগ করা হয়। এভাবে খোদার খাতিরে এমন রূপে অর্থ উপার্জন করা উচিত যা হালাল পন্থা। রুজি-রোজগার যদি হারাম পন্থায় করা হয় তাহলে তাকে খোদার খাতিরে তাবাত্তুল অবলম্বন করতে গিয়ে স্বীয় পায়ে কুঠারাঘাত করতে হয় .....অতএব যে ব্যক্তি যে কাজে নিয়োজিত আছেন, তিনি খোদাকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখুন, তাহলে কোন ভয় নেই। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে ঐশী সন্তুষ্টির মাধ্যমে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করার তৌফীক দান করুন! আমীন।

(৪ঠা নভেম্বর '৯৩ তারিখের সাপ্তাহিক বদরের সৌজন্যে)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ)

- স্মরণ রেখ, সত্যবাদিতা এমন একটি জিনিষ যা মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে বলে দেয়।
- আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যিক্‌রে ইলাহীতে ভরপুর হওয়া উচিত।

হাদীসুল মাহদী

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্বে প্রকাশিত অংশের পর)

হাদীস নং ১৩

عن ذى مخبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم و هم عدوا من ورائكم فتنصرون و تغنمون و تسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذى تلول فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذالك تغدر الروم و يجمع للملحمة فيثور المسلمون الى اسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة (رواه ابوداؤد)

"জুমুখ্‌বির হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অচীরে খৃষ্টানদের সহিত শান্তিপূর্ণ সন্ধি স্থাপন করিবে ; তৎপর তাহারা ও তোমরা অপর একদল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহাতে তোমরা জয়যুক্ত হইবে ; এবং শত্রুদের রণসম্ভার লুণ্ঠন করিবে, এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিয়া উচ্চ তৃণক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। তৎপর একদল খৃষ্টান ক্রুশ উত্তোলন করিয়া বলিবে, ক্রুশ জয়যুক্ত হইয়াছ ; ইহাতে একজন মুসলমান রাগান্বিত হইয়া ক্রুশ ভাংগিয়া ফেলিবে সেই সময় সেই খৃষ্টানরা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এবং মহাযুদ্ধের জন্য একত্রিত হইবে, ইহাতে মুসলমানগণও নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্রের দিকে ধাবিত হইবে এবং যুদ্ধ করিবে ; অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত মুসলমানদিগকে শাহাদতের দরজায় গৌরবান্বিত করিবেন। (আবুদাউদ)

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই হাদীসেও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথা নাই ; মসীহে মাওউদ (আঃ)-এরও উল্লেখ নাই। এই হাদীসে আছে খৃষ্টান-মুসলিম যুদ্ধের কথা, খৃষ্টান মুসলিম সন্ধির কথা, খৃষ্টানদের বিশ্বাসঘাতকতা করিবার কথা ও মুসলমানদের শহীদ হইবার কথা।

ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাত ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

و كان بين المسلمين و بينهم هدنة فغدرها و اخذها ونكل بهم وعذبهم واسكنهم المطامير والحبوس الحرجة و ذكروا له حديث الهدنة فقالوا قولوا

لمحمد كم يخلصكم فلما بلغه رحمه الله ذالك عنه نذر انه متى اظفره الله به
قتله بنفسه (سيرة صلاح الدين لابن شداد ص ٢٧)

"মুসলমান এবং খৃষ্টানদের মধ্যে সন্ধি হইয়াছিল। অতঃপর খৃষ্টানেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল এবং মুসলিম সৈন্যদলকে কয়েদ করিয়া বিভিন্ন রকমের কষ্ট দিয়াছিল, স্বল্পপরিসর কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন সেই মুসলমানগণ খৃষ্টান সেনাপতিকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত খৃষ্টানদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, সে বলিয়াছিল, তোমরা তোমাদের মুহাম্মদকে (সাঃ) বল, তোমাদিগকে এখন মুক্ত করিয়া দিতে, এই সংবাদ পাইয়া সুলতান গাজী সালাহ্উদ্দিন শপথ করিয়া ছিলেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে জয়যুক্ত করিলে আমি এই ব্যক্তিকে নিজ হাতে হত্যা করিব।" (সুলতান সালাহ্ উদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ইবনে সাদ্দাদ লিখিত সুলতান সালাহ্ উদ্দিনের জীবনী : ২৭ পৃঃ)।

পাঠক দেখিতে পাইলেন খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন্ধি এবং সন্ধির পর খৃষ্টানদের বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হইয়াছে দেখিয়া তৎকালীন বিশেষজ্ঞগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়াছেন। কিন্তু মৌলানা রূহুল আমিন সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ইহা ইমাম মাহদীর যমানায় ঘটিবে অথচ মাহদীর কোন কথাই এই হাদীসে নাই। (ক্রমশঃ)

ভারতীয় বন্ধুগণ !

বাংলাদেশে ডাক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে প্রতিটি আহমদী পাঠাতে পাঁচ টাকা লাগে বৎসরে একশত বিশ টাকা। আমরা নিয়মিত ৬৮টি পত্রিকা পাঠাচ্ছি। অথচ বাৎসরিক চাঁদা দূরের কথা ডাক খরচই আদায় হচ্ছে না। আপনারা দয়া করে সত্বর বাৎসরিক চাঁদা জনাব মাশরেক আলী সাহেবের কাছে জমা দিন। অন্যথায় পত্রিকা পাঠান সম্ভব হবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য, ভারতীয় বন্ধুগণ উপযুক্ত ডাক টিকিট লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট করবেন। তা না হলে চিঠি বিয়ারিং হয়ে যাবে। আমাদের পক্ষে সরাসরি পত্র যোগাযোগ সম্ভব নয়। কারণ এখানে ভারতের জন্য একটি কার্ডের মূল্য পাঁচ টাকা এবং ইনভেলাপ আট টাকা।

নির্বাহী সম্পাদক

জীবন বিধান ও আল কুরআন

ডাঃ মোঃ নূরুল আলম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কারীদের অবশ্য প্রাপ্ত শাস্তি

ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান ও শাসনকার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত নিজেদের কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার করে। কুরআন কোন নির্দিষ্ট বংশ দ্বারা দেশ শাসন বা বংশানুক্রমিক শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ সমর্থন করে না। জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনকে অনুমোদন করে এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকে ভোট দিয়া নির্বাচন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে।

কেবল সেই নিয়ম ব্যতীত যাহা সর্বোত্তম, তোমরা এতীমের ধন সম্পদের নিকটে যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সাবালক হয়। এবং ন্যায়সংগতভাবে মাপ ও ওজন পুরাপুরি দাও। আমরা কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। এবং যখন তোমরা ন্যায়বিচার কর যদিও (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন, এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর ইহা সেই বিষয় যাহার তাগিতপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (৬ : ১৫৩)।

যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে গণনা করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমরা আদৌ উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় (১৬ : ১৯)।

আমরা নিশ্চয় সত্যসহ এই পূর্ণ কিতাব তোমার প্রতি এইজন্য নাযেল করিয়াছি যেন আল্লাহ্ তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তদ্বারা তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হইও না (৪ : ১০৬)।

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে যদি (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের পিতামাতার বা স্বজনগণের বিরুদ্ধেই হউক। (যাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে) যদি সে ধনী হয় অথবা দরিদ্র হয় তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাংখী। সুতরাং হীনকামনার অনুসরণ করিও না, যাহাতে তোমরা ন্যায়বিচার করিতে পার এবং যদি তোমরা কথা পেচাইয়া (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়াইয়া যাও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) তোমরা

যাহা কিছু কর তদসম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন (৪ঃ১৩৬)।

হে মোমেনগণ! আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায়সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে আদৌ এই অপরাধ করিতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা যে কাজকর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত (৫ঃ৯)।

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার কর। আল্লাহ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় ইহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (৪ঃ৫৯)।

যাহারা ভাল কাজ করে তাহারা ভাল ফল পাইয়া থাকে আর যাহারা অন্যায় কাজ করে তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ শাস্তি পাইয়া থাকে।

তুমি বল, তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ্র আযাব তোমাদের উপর অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যভাবে আপতিত হয় তাহা হইলে যালেম জাতি ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও কি ধ্বংস করা হইবে (৬ঃ৪৮)?

এবং রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়া থাকি, সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সংশোধন করে সেই অবস্থায় তাহাদের জন্য কোন ভয়ও থাকিবে না এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না (৬ঃ৪৯)।

যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে আযাব তাহাদিগকে আক্রান্ত করিবে, যেহেতু তাহারা দুষ্কর্ম করিত (৬ঃ৫০)।

এবং তোমার প্রভুর গ্রেফতার এইভাবেই হয় যখন তিনি জনপদসমূহকে গ্রেফতার করেন এমতাবস্থায় যে, তাহারা যুলুম করিতে থাকে। নিশ্চয় তাঁহার গ্রেফতার বড়ই যন্ত্রণাদায়ক (১১ঃ১০৩)।

ইহাতে তাহার জন্য এক নিদর্শন আছে যে, পরকালের আযাবকে ভয় করে। ইহা সেইদিন যেদিন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে একত্র করা হইবে, ইহা সেইদিন যাহাকে সকলে প্রত্যক্ষ করিবে (১১ঃ১০৪)।

এবং আমরা ইহাকে কেবল এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করিতেছি (১১ঃ১০৫)।

ইসলামে মুক্তির মাপকাঠি

—মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রহঃ)

বৈদিক ধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম এই তিনটিই নাজাত বা মুক্তিতে বিশ্বাসী। সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এ জীবনের অবসানে মানুষের আর একটি জীবন রয়েছে। সেখানে মানুষ নিজ নিজ কর্ম ফল অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে। অন্য ভাষায় মানুষ তার পুণ্য কর্মের ফলে বেহেশ্‌ত ও পাপের ফলে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। কম বেশী মূলতঃ উপরোক্ত সব ধর্মই নাজাত বা মুক্তিতে বিশ্বাসী।

পুনর্জন্মবাদ বৈদিক ধর্মের একটি মৌলিক বিশ্বাস যার ফলে মানুষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে জন্ম পরিগ্রহ করে এবং অবশেষে তাকে একটি সীমার মুক্তি-খানায় আশ্রয় দান করা হয়। যার অবসানের পর পুনরায় তাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জন্ম ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ তারা একটি সীমাবদ্ধ নাজাত বা মুক্তিতে বিশ্বাসী। বৈদিক দর্শনের উপরোক্ত বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই বিশ্বাসও পোষণ করে থাকেন যে, ঈশ্বর মানবকুলের পাপ মোচনে সম্পূর্ণ অক্ষম। প্রত্যেক পাপীকে তার কর্মফল অনুযায়ী কুকুর, বানর, শূকর প্রভৃতি আকার ধারণপূর্বক জন্ম নিতে হবে। মূল কথা বৈদিক দর্শন অনুযায়ী নাজাত বা চির মুক্তির কোন প্রশ্নই আসে না।

খৃষ্ট ধর্ম অনুযায়ী মুক্তির আকাঙ্খা প্রত্যেক মানুষের ভিতরই বিদ্যমান রয়েছে। তবে পাপী মানবের জন্য এই ধর্মে মুক্তি লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না; কারণ তাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্ত আদম সন্তান পাপী সাব্যস্ত হয়েছে। খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী খোদা মানবের পিতা বটে কিন্তু এরূপ পিতা যে তার কোন সন্তানকে পাপের প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকে ক্ষমা করতে অপারগ; এজন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌ মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে বহু চিন্তার পর আজ হতে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন, এবং তাঁর একমাত্র জাতপুত্রকে ইহুদীদের হাতে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়ে ও তিন দিবা রাত্রি হাবিয়া দোযখে অবরুদ্ধ রাখতে বাধ্য হলেন। যারা যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুতে বিশ্বাসী তারা মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু এই মুক্তি লাভের ফলে মানব গোষ্ঠীর পূর্বকৃত সমস্ত পাপের ক্ষমাও যদিওবা সম্ভব হবে কিন্তু পরবর্তী সময়ে যদি কোন পাপ করা হয় তাহলে তার শাস্তি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী নরক চিরস্থায়ী এবং অনন্ত অসীমকাল পর্যন্ত প্রত্যেক মানবকে সেখানেই অবস্থান করতে হবে। খ্রীষ্টানদের এই বিশ্বাস অনুযায়ী নাজাত বা মুক্তি একটি কল্পনা মাত্র। জগতে কি এরূপ খ্রীষ্ট মতাবলম্বী বিদ্যমান রয়েছে, যে যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপনের পর আর কোন পাপ করে নাই?

পাপ থেকে পরিত্রাণ অথবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে রক্ষা পাওয়ার নামই নাজাত বা মুক্তি। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীতে পাপ থেকে মুক্তি লাভই মানব জীবনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য নয় বরং তারও উর্দ্ধে ইসলাম মানবের জন্য 'ফওয ও ফালাহ' বা অভিপ্রেত সাফল্য দানের অঙ্গীকার করেছে। অর্থাৎ ইসলাম অনুযায়ী মানব সৃষ্টির মোক্ষ উদ্দেশ্য তার স্রষ্টার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব হিসাবে মানুষকে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হওয়ার আদেশ কুরআন দিয়েছে। পাপ হতে মুক্তি লাভ করাও মানুষের একটা মহৎ কামনা বটে—কিন্তু তার উর্দ্ধে স্রষ্টার যাবতীয় গুণাবলী নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করাও একটি উল্লেখযোগ্য কামনা।

ইহাকেই ইসলাম 'ফালাহ্‌' আখ্যা প্রদান করেছে। বস্তুতঃ ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে আরও অগ্রসর হয়ে মানবের জন্য ফালাহ্‌ প্রদানের অঙ্গীকার করেছে।

ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী পাপীদের জন্য নরক বা দোযখ চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেক পাপীই নরকে তার পাপের প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করার পর নরক হতে মুক্তিলাভ করবে এবং সকল মানুষই একদিন আল্লাহ্‌র অনন্ত অসীম বেহেশ্‌তের অধিকারী হবে। মূলকথা প্রত্যেক মানবের ভিতরেই পাপ ও পুণ্য উভয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে এবং ইহ-জগতেই মানুষ নিজ চেষ্টা ও কর্মফল দ্বারা পাপ হতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে।

ইসলামী মতবাদ অনুযায়ী যেখানে পাপ করার প্রবৃত্তি মানবের অন্তর হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে সেইরূপ পাপ হতে মুক্তি বা পরিত্রাণের উৎসও মানবাত্মার অন্তরেই নিহিত রয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ মানব জাতির জন্য এই সুসংবাদ দিয়েছেন—'লাতাকনাতু মির রাহ্‌মাতিল্লাহ্‌ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফেরুজ্‌ জুনুবা জামিয়া" হে পাপী মানব! আল্লাহ্‌র রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদের সমুদয় পাপ ক্ষমা করবেন।

সুতরাং ইসলামের এই আশার বাণী সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে অফুরন্ত আশা ও আকাঙ্খার সঞ্চার করেছে, কারণ পাপের বোঝা মানুষকে হতাশার দিকে ঠেলে দেয় এবং আশা আকাঙ্খা মানুষকে সত্যিকার শান্তিপূর্ণ জীবন ধারণের প্রেরণা দান করে। সুতরাং ইসলামের এই আশার বাণী মানবজাতির জন্য একমাত্র সম্বল।

প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানই আল্লাহ্‌র এই বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন যে, বিচারের দিনে যখন মানবজাতির পাপ ও পুণ্যের ওজন করা হবে—তখন যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা দোযখের অধিবাসী হবে এবং যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারা স্বর্গবাসী হবে (সূরা আ'রাফ ৮ ও ৯ আয়াত)।

মূলকথা পৃথিবীর এই পরীক্ষায় যারা ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫১ নম্বর লাভ করবে তারা পাশ বলে গণ্য হবে ও বেহেশ্‌তে দাখিল হবে। তদোর্দ্ধে যারা অর্জন করবে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ নম্বর অনুযায়ী দর্জা বা পদমর্যাদা লাভ করবে। এটি ইসলামের কতই না সুন্দর ব্যবস্থা যদ্বারা সব ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়!

হারাম কত দিন চলবে ?

—এম, এ, মজিদ

মোল্লা সাহেব হারাম কতদিন চলবে ?

না জেনে শুনে আসর গরম করার ফতওয়া দিলে সব কিছু যদি হারাম হয়-তাহলে পরে সে বস্তু বা বিষয়, জিনিষ হালাল হয় কী রূপে ? এক কালের ফতওয়া, মাইকে আযান দেওয়া হারাম। এখন মাইকে আযান না দিলে ঘুম ভাঙ্গে না। ফজরের নামায কাযা হওয়ার সম্ভবনা।

ছবি তোলা হারাম, এখন মোল্লামৌলবীদের সংগ্রাম, সোনার বাংলা পত্রিকাগুলো ছবিতে ভরপুর। যে কেউ হাতে ধরলে দেখতে পাবেন।

ইংরেজী শেখা হারাম স্যার সৈয়দ আহমদ জাতির ভবিষ্যত ভেবে ইংরেজী শিখতে আহ্বান জানালে তাকে কাফের বলা হলো। এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা জনাব সাইদী সাহেব বক্তৃতার মাঝে মাঝে ইংলিশ বলেন। কোন হারাম জিনিষ বা বিষয়, বেশি দিন হলে কি হালাল হয়ে যায় ? ব্রিটিশের সময় ইংরেজি শেখা হারাম হলে এখন হালাল হয় কী রূপে ?

মানুষের চাঁদে যাওয়া বিশ্বাস করা হারাম। পুরোনো ফতওয়া আজ হালাল হয়ে গেছে। ডিস্ এন্টেনা মসজিদের ছাদে লাগিয়ে যদি বিদেশী, হজ্জ, যাকাত, নামায, খুতবা এসব দেখি বা শুনি তাহলে মোল্লাদের মনে আঘাত দিচ্ছে। পুরোনো হলে আঘাত কি মুছে যাবে ?

কোন নির্বাচনে মহিলাদের সমর্থন দেওয়া নাজায়েয অথচ এইতো সেদিন বাংলাদেশ হওয়ার পূর্বে ফতেমা জিন্না আর আয়ুব খাঁন এর নির্বাচনে কোন ইসলামী দল ফাতেমা জিন্নার হারিকেন মার্কায় সমর্থন দিলেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সাথে ৯২-এর নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে মহিলাদের কত দোষ-ই না জনসভায় প্রকাশ করলেন, অথচ শেষ হতে না হতেই আবার সেই সরকার এর সমর্থন দিলেন—তারপরও মহিলা সাংসদ সাথে নিয়ে.....।

তাই বলি এ হারাম ফতওয়া আর কত দিন চলবে ?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

- যে কুরআনকে সম্মান প্রদর্শন করবে সে আকাশে সম্মান লাভ করবে।
- যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যাকে পরিহার না করে, সে সুরভিত হতে পারে না।

ডিশ এলো

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জমান

ডিশ এলো ডিশ এলো
অর্ধচন্দ্র গোলাকার
আখেরী জামানার বিস্ময়
বৈজ্ঞানিক আবিস্কার,
এই ডিশ সেই ডিশ নয়
এ যে টিভির এন্টিনা
ঘরে বসে দেখতে পাবেন
বিশ্বের সকল ঘটনা,
ডিশ এলো ডিশ এলো
দেখতে বড়ই চমৎকার
ডিশের গুণে দূর হবে
সাম্প্রদায়িক অন্ধকার।
মুসলিম টিভি আহমদীয়া
ডিশের সেরা অবদান
নৃত্যগীত আর ডিসকো নয়
তৌহীদ পানে আহ্বান,
যুগ ইমামের প্রেমের বাণী
কলেমার দাওয়াত বিশ্বময়
ফতওয়াবাজ মোল্লাতন্ত্রের
এখন বড়ই দুঃসময় !
হুজরায় বসে করত যারা
ইমাম মাহদীর (আঃ) মুণ্ডুপাত
তাদের বড়ই করুণ দশা
মাঝ মাথায় বজ্রপাত,
ইসলামের বিশ্ব বিজয়
রুখবে এবার সাধ্যকার
ডিশের গুণে দূর হবে সব
অধর্ম আর মিথ্যাচার।

একটি দাওয়াত এবং আনুষঙ্গিক কথা

('দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রতি শুক্রবার 'ইসলাম ও আমরা' নামে জনাব সা'দ উল্লাহ একটি ফিচার লিখে থাকেন। তিনি এই ফিচারে ২৩/৭/৯৩ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্বন্ধে কিছু ভুল তথ্য প্রকাশ করেন, যার সংশোধনী রূপে ২৫/১১/৯৩ তারিখে পুনরায় আরো কিছু তথ্য যুক্ত করে অপর একটি ফিচার প্রকাশ করেছেন। তবে এই ফিচারেও অল্প স্বল্প ভুল তথ্য রয়েছে। আমরা ভুলগুলি সংশোধন না করেই হুবহু ফিচারটি ছেপে দিলাম)।

"গত ৩রা নভেম্বর আমার এক বন্ধু নূরুদ্দিন এক দাওয়াত নিয়ে এলেন: একটি আলোচনা চক্রে যাওয়ার জন্য এই দাওয়াত। স্থান শহরের একটি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট। সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট সম্বন্ধে "যায় যায় দিন" বিভিন্ন লেখকের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মজার মজার গল্প দিয়ে "বিশেষ সংখ্যা" বের করেছিল। তাই খাওয়ার লোভে নয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য দাওয়াত নিলাম।

আলোচনার বিষয়বস্তু জানা ছিল না। আমার দাওয়াতকারী বন্ধু ভেঙে বলেন নি। যাহোক গেলাম, অন্য এক বন্ধু সালামকে সাথে নিয়ে তিনিও নিমন্ত্রিত।

সময়মত রেষ্টুরেন্টে গিয়ে শুনি পাকিস্তান থেকে এক আহমদী ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি পাকিস্তানে আহমদী সম্প্রদায়ের ওপর যে নির্যাতন চলছে তার ওপর কিছু বক্তব্য রাখবেন। ভদ্রলোকের নাম আনোয়ার। এসেছেন পাঞ্জাবের 'রাবওয়া' থেকে।

যথারীতি বক্তৃতা বা নিবেদন যাইহোক, আরম্ভ হলো। আমার মতো অনেক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত। বেশীর ভাগই অ-আহমদী। গেছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। জনাব আনোয়ার অনেক কিছু বলেন, জামা'তের নীতি-তাদের প্রচার কার্যের কার্যক্রম ইত্যাদি। তিনি উরদুতেই বলছিলেন মাঝে মধ্যে ইংরেজী। তবে তাঁর বক্তব্যের সারাংশ করে দিচ্ছিলেন দো-ভাষীর কাজে নিয়োজিত অন্য এক ভদ্রলোক। তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পেল যে, আহমদী জামা'তের প্রচারকার্য পৃথিবীর ১২৬টি দেশে চলছে এবং ইসলাম প্রচারের সাথে পবিত্র কোরানের চীনা ও রাশিয়ান ভাষাসহ, ১১৭টি ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচার করা হচ্ছে?

জামা'তের দ্বারা লাখ লাখ খৃষ্টান, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং করছে;

তবুও এই সম্প্রদায় নিজের জন্মভূমেই নিষিদ্ধ হয়ে গেল। প্রথমে ১৯৭৪ সালে মাওলানা মুফতি মাহমুদ ও মাওলানা মওদুদীর প্ররোচণায় জনাব ভূট্টো পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আহমদী মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে অমুসলমান (Not Muslim) ঘোষণা

করে সংবিধান সংশোধন করলেন। তারপর শুরু হল আহমদীদের জান মাল ও ইজ্জতের ওপর হামলা। নারী পুরুষ শিশু নির্বিচারে নির্যাতিত হলো, লুট হলো কোটি কোটি টাকার সম্পদ। তারপর জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৮৪ সালে Anty Islamic Activities of the Quadiw Group Lahore Group and Ahmadis (Prohibition and Punishment Ordinance 1984) জারি করেন; যার ফলে পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের সর্বপ্রকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয় এবং কেউ এই সম্প্রদায়ের রীতিনীতি পালন করলে আইনত দণ্ডনীয় হবে (তিন বছর জেল ও জরিমানাসহ)। এরা আজান দিতে পারবে না। নিজেদের মুসলমান বলতে পারবে না ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে লাহোরের দৈনিক আফাক-এর সম্পাদক জনাব শওকত হোসেন শওকত। (একজন অ-আহমদী) ১ মে সংখ্যায় অফ দি রেকর্ড নামে একটি নিরপেক্ষ ইংরেজী প্রবন্ধের এক অংশে উল্লেখ করেছেন ... "আমার ওপর অপবাদ দেয়া হবে যে, আমি মির্যায়ীদের (আহমদীদের) পক্ষে ওকালতি করছি।..... বলা হয় আহমদীরা এটা করে সেটা করে! তাদের মহিলারা খুব সুন্দরী।.....তিনি প্রশ্ন রেখেছেন—এরূপ অসংলগ্ন কথাবার্তা মানুষের নৈতিক সনদ ও ইসলাম ধর্মের নৈতিকতার সাথে কতটুকু সম্পর্কিত"?

বক্তৃতায় আরও উল্লেখ করা হয়। আলমী মজলিসে তাহ্‌ফুজে খতমে নবুয়ত, বাংলাদেশ সম্প্রতি সংসদ সদস্যদের কাছে একটি দাবিনামা পেশ করেছেন। দাবি হচ্ছে (১) আহমদীদের অন্য রাষ্ট্রসমূহের মতো অমুসলিম ঘোষণা করা হোক (২) আহমদীদের তফসিরে কোরআন ও অন্যান্য পুস্তক বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক, (৩) ইসলামী পরিভাষা যেমন নামাজ, রোজা, মসজিদ, খলিফা ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক এবং (৪) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আহমদীদের অপসারণ করা হোক।

আহমদীদের বিরুদ্ধে এই দাবি অন্যান্য প্রচার দ্বারা বাংলাদেশের ধর্মভীরু সরল মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বকশীবাজারের মসজিদ আক্রমণ ও লাইব্রেরী পোড়ানো যাতে পবিত্র কোরআনসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হয়েছে এবং ৮ অক্টোবর (১৯৯৩) স্থানীয় একটি পত্রিকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কাদিয়ানী মসজিদে টিভি সেট ও ডিশ এন্টেনা স্থাপনের মাধ্যমে অশ্লীল সিনেমা ও নীল ছবি প্রদর্শন—এই মর্মে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। অথচ স্থানীয় প্রশাসনের তদন্তে এই সংবাদ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

উপরোক্ত বক্তব্য আমার নয়, বক্তার বক্তব্য। তাঁর ভাষণের সারসংক্ষেপ। বক্তার শেষ আবেদনটি ছিল আহমদীরা কি, তাদের নীতি এবং প্রচার কার্য কোন বিষয়ে, আপনারা আসুন, দেখুন বিচার করুন। তারপর তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিন, আপত্তি নেই। উস্কানিতে উত্তেজিত হয়ে কোন গর্হিত কাজ করা বা মানুষকে আক্রমণ করে হত্যা করা

বা শাস্তি দেয়া এই কি ইসলামী আদর্শ, এই কি ইসলামী নীতি, এই কি ইসলামী দীক্ষা। এতগুলো প্রশ্ন রাখলেন বক্তা মোহাম্মদ আনোয়ার।

আমি শ্রোতা, বক্তব্য কিছুই নেই। শুধু তুলে ধরলাম বক্তার বক্তব্যের কিছু অংশ। আকেলমন্দ যারা, তাঁরা চিন্তা করুন। কারণ আকেলমান্দ কো ইশারা কাফী।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভাঙা হাটে জনাব এটি চৌধুরীর সাথে দেখা। তিনি ধরে বসলেন। বললেন, সাদ ভাই, আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম "কুয়্যো ভ্যাদিস-২ সিরিজে গোলাম আহমদ কাদিয়ান সম্পর্কে একটা ভুল তথ্যের সংশোধনীর জন্য। আমার মনে পড়লো। বললাম দেবো। ভুল হয়ে থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত, কিংবা অজ্ঞতাবশত। অপরাধ নেবেন না। ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে আমার বাধে না।"

চৌধুরী সাহেব সৌজন্যের সাথে করমর্দন করে বলেন—মাশাল্লাহ।

গত ২৩-৭-৯৩ইং তারিখে এই কলামে আহমদী সম্প্রদায় সম্পর্কে লিখেছিলাম। সেখানে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান-এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য অসম্পূর্ণ ছিল সেটা পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করছি।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ সালে পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মির্যা গোলাম মর্তুজা মাতার নাম চেরাগ বিবি। গোলাম আহমদ যমজ ছিলেন এক বোনের সাথে, যিনি জন্মের কিছু দিন পরেই মারা যান। নাম ছিল জান্নাত বিবি। এক বড় ভাই ছিল নাম গোলাম কাদের। চাচার নাম মির্যা গোলাম মহিউদ্দিন—তাঁর তিন পুত্র (১) ইমামুদ্দিন (২) নিজাম উদ্দিন এবং (৩) কামালুদ্দিন এবং কন্যা উমরান নেছা বেগম।

সতের বছর বয়সে গোলাম আহমদ-এর মামাতো বোন হুরমত বিবির সাথে বিয়ে হয় এবং বিয়ের চার বছরের মধ্যে দুই সন্তান জন্মে। (১) সুলতান আহমদ ও (২) ফজল আহমদ। স্ত্রীর সাথে তেমন ভাল সম্পর্ক না থাকায় সম্বন্ধ টিকেনি। হুরমত বিবি দুই পুত্রকে নিয়ে ভাসুরের (মির্যা গোলাম কাদের) সংসারে উঠেন, যাদের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। এরপর মির্যা গোলাম আহমদ নিসঙ্গ জীবন বেছে নেন ও ধর্মে কর্মে মনোনিবেশ করেন।

প্রায় ২৬ বছর ধরে মির্যা গোলাম আহমদ ব্যাচালার জীবন যাপন করেন। ১৮৮১ সালে তিনি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে 'ইলহাম পান' দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য বলে দাবী করা হয় এবং ১৮৮৪ সালে ১৭ নভেম্বর দিল্লীর বিখ্যাত খাজা মীরদাদ বংশে বিয়ে করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম সৈয়দা নূসরত জাহান বেগম। তখন মির্যার ৫০ বছর বয়স। এই

সময়ে দু'টো মারাত্মক রোগে তিনি ভুগতেন-একটি মাথা ধরা অন্যটি বহুমূত্র (ডায়বেটিকস) তবুও এই দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তাঁর দশটি ছেলে মেয়ে। (১) ইসমত বিবি (জন্ম ১৮৮৬) (২) বশীর আওয়াল (জন্ম ১৮৮৭), (৩) বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (১৮৮৯), (৪) শওকত (১৮৯১), (৫) বশীর আহমদ (১৮৯৩), (৬) শরীফ আহমদ (১৮৯৫) (৭) মোবারক বেগম (১৮৯৭) (৮) মোবারক আহমদ (১৮৯৯) (৯) আমাতুন নাসির (১৯০৩) আমাতুল হাফিজ (১৯০৪)। উপরোক্ত সন্তানদের মধ্যে ইসমত বিবি, বশীর আওয়াল, শওকত, মোবারক আহমদ ও আমাতুন নাসির অল্প বয়সেই মারা যায়। মির্যা আহমদ যখন ১৯০৮ সালে মারা যান তখন তাঁর ছোট মেয়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর।

মির্যা আহমদের প্রথম তরফের দুই পুত্রের মধ্যে (যারা বড় চাচা গোলাম কাদেরের আশ্রয়ে ছিল) বড় ছেলে সুলতান আহমদ-এর বিয়ে তাঁর চাচীর ভাই নিজামুদ্দিনের মেয়ের সাথে এবং এই নিজামুদ্দিনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে মির্যা আহমদের মামলা হলে বড় পুত্র সুলতান আহমদ শ্বশুরের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং পিতার মতবাদে তিনি বড় একটা বিশ্বাসী ছিল না। সুলতান আহমদ সরকারী চাকুরি করতেন এবং ব্রিটিশ সরকারের বশংবদ হিসাবে "খান বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ছোট ভাই ফযল আহমদ পিতার জীবদ্দশায় আহমদী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু পরে জামাতের দ্বিতীয় খলিফা মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ-এর (অর্থাৎ সৎ ভাই) হাতে বায়েৎ হন।

১৮৮৮ সালে গোলাম আহমদ তাঁর চাচার কন্যা উমরান নেছা বেগম ও আহমদ বেগের মেয়ে মোহাম্মদী বেগের সাথে বিবাহের 'ইলহাম' পান আল্লাহর তরফ থেকে—অর্থাৎ তিনি মোহাম্মদী বেগমকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু আহমদ বেগ এ বিয়েতে সম্মত ছিলেন না। তাই আবার আল্লাহর নিকট থেকে মির্যা আহমদ 'ইলহাম' পান এই মর্মে যে, আহমদ বেগ এ বিয়ে না দিলে আড়াই বছরের মধ্যে তিনি মারা যাবেন। তখন এ বিয়ে হবে। কিন্তু এই 'ইলহাম' অগ্রাহ্য করে আহমদ বেগ মেয়ের বিয়ে দেন লাহোর জেলার পট্টি নিবাসী সুলতান মোহাম্মদ এর সাথে। ফলে আহমদ বেগ এ বিয়ের ছ' মাসের মধ্যে মারা যান। এই অবস্থায় মোহাম্মদী বেগমের আম্মা উমরান নেছা বেগম এবং তাঁর স্বামী সুলতান আহাম্মদ মির্যা আহমদের নিকট গিয়ে দোয়া প্রার্থী হলে মির্যা আহমদ অভিশাপ ফিরিয়ে নেন। মোহাম্মদী বেগম মির্যা আহমদের চাচাতো বোন উমারান নেছা বেগমের কন্যা আর আহমদ বেগের বড় ভাই মোহাম্মদ বেগের সাথে মির্যা আহমদের বোনের বিয়ে হয় এবং মির্যা আহমদের বড় ভাই গোলাম কাদেরের স্ত্রী মোহাম্মদী বেগমের আপন খালা সুতরাং সকলেই পরিবারভুক্ত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—একথা দাবি করলেন যে, মির্যা গোলাম আহমদ আল্লাহর কাছ থেকে 'ইলহাম' পেয়েছিলেন যে, তাঁর বংশ বৃদ্ধি হবে

এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁরা ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁর পূর্ব পুরুষ অন্য সকলেই নির্বংশ হবেন। বর্তমানে মির্যা আহমদের খান্দানে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা প্রায় চার শতাধিক। তাঁর চাচা গোলাম মহিউদ্দিনের অধঃস্তন বংশধর মির্যা গুল মোহাম্মদ নিঃসন্তান হয়ে মারা যান।

মির্যা গোলাম আহমদের মৃত্যু হয় ২৬মে, ১৯০৮ সালে এবং ২৭ মে কাদিয়ানে সমাহিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর হেকিম নূরুদ্দিন এই সম্প্রদায়ের ১ম খলিফা নির্বাচিত হয়ে ১৯১৪ সালে মারা যান। এর পর মির্যা আহমদ-এর ৩নং সন্তান (মোসলেহ মাওউদ) মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ মাত্র ২৫ বছর বয়সে ২য় খলিফা নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। তাঁর খলীফা নির্বাচনের সময় এই সম্প্রদায়ের মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং খাজা কামালুদ্দিনের নেতৃত্বে (১৮৭০-১৯০২) এক নতুন দলের উদ্ভব হয় এবং মোহাম্মদ আলী, সদরউদ্দিন, ডাক্তার বশারত আহমদ এবং মির্যা ইয়াকুব বেগ সমন্বয়ে "লাহোর গ্রুপ" প্রতিষ্ঠা করেন। এরা "আঞ্জুমানে ইশাআত-ই-ইসলাম" নামে প্রচারকার্য শুরু করেন। লণ্ডনের ওকিং মসজিদ এদের কর্ম কেন্দ্র।

'কাদিয়ানী গ্রুপ'-এর দ্বিতীয় খলিফা মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ ১৯০৩ সালে (খলিফা হওয়ার আগে) মাত্র ১৫ বছরের মাহমুদা বেগমকে বিয়ে করেন, যিনি পরে সৈয়দা উম্মে নাসির নামে পরিচিত (কারণ এদের সন্তান মির্যা নাসের আহমদ ১৯৬৫ সালে তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন)। বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ ১৯১৪ সালের ১৪ই এপ্রিল খলিফা হয়েই ঐ বছর মে মাসে ১ম খলিফা নূরুদ্দিনের কন্যা আমাতুল হাইকে বিয়ে করেন। তারপর ১৯২৫ সালে সারা বেগমকে বিয়ে করেন। এবং আরও পরে বিয়ে করেন সৈয়দা উম্মে তাহিরকে। ইনি বর্তমান খলীফা মির্যা তাহির আহমদের আম্মাজান। এখন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের খলিফা, প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমদ-এর বংশের বাইরে থেকে হয় না। মির্যা তাহির আহমদ খলিফা হন ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮২ সালে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের টিলফোর্ডে 'ইসলামাবাদে (সারে) নামক স্থানে বসবাস করছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বর্তমানে ১৩৬টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। আহমদী জামা'তের জন্মভূমি পাকিস্তান নয়। বড় ছেলে মির্যা সুলতান আহমদ দ্বিতীয় খলীফার হাতে বয়াত করেন। দ্বিতীয় ছেলে ফযল আহমদ পিতার জীবদ্দশায়ই মৃত্যু বরণ করেন। আহমদী জমাতের খলীফা বংশের বাইরে থেকে হয় না—একথা সত্য নয়। খাজা কামাল উদ্দীনের নেতৃত্বে নয় মৌলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে লাহোরী জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ওকিং মসজিদ লাহেরীদের প্রতিষ্ঠিত নয়। বর্তমানে এই মসজিদ অন্যদের দখলে। বর্তমান খলীফা সাহেব খলীফা হন ১০ই জুন, ১৯৮২ তারিখে। —আহমদী।

ওয়াকফে নও

(পিতামাতার পথ-নির্দেশের জন্যে)

মূল ঃ—খুরশীদ আতা

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

চতুর্থ পর্যায় (২ বছর থেকে ৪ বছর বয়স পর্যন্ত)

যেভাবে প্রথমে বলা হয়েছে যে, শিশু অনুকরণপ্রিয় স্বভাবের কারণে প্রত্যেক বিষয় শিখবে যা সে দেখে। আর তার স্মরণশক্তিও তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। তার মধ্যে অসাধারণ শক্তি থাকে যাকে সে সর্বদা চঞ্চলতার অবস্থায় থেকে অহরহ কথা বলে ব্যয় করে ফেলে। সে দেখে, সে শিখে, আর এসব চিন্তাভাবনাকে সারা জীবনের জন্যে সংরক্ষণ করে নেয়। অন্য কথায় তার পূর্ণ তরবীয়তের সূচনা ঘরের পরিবেশের মধ্যে এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়া-কর্মের নমুনা থেকে হয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে গভীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

যদি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দৃষ্টিতে রাখা হয় এবং সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয় তাহলে খুবই ইতিবাচক সুফল লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হিংসা থেকে বাঁচাবার জন্যে সব শিশুর সাথে একই ব্যবহার করুন। ওয়াকফে নও শিশুকে অপ্রয়োজনীয় প্রাধান্য দিবেন না, যাতে সে 'বড় মানুষী' এর অনুভূতির শিকার হয় আর অন্যান্য ভাই-বোন হীনমন্যতার শিকার হয়। আর ওয়াকফে নও শিশু যেন হীনমন্যতার শিকার না হয়। ওয়াকফে নও শিশু যেন হীনমন্যতার শিকার হয়ে অন্য শিশুদেরকে হিংসা না করতে থাকে এবং যেন খুবই সঙ্গীন অবস্থায় ঘৃণা না জন্মে। (স্মরণ থাকা উচিত যে, অসাধারণ আচরণ কেবল ঘৃণা আর ভালবাসার মাঝে দোলায়িত হওয়ার অবস্থায় সৃষ্টি হয়)। এ বয়সে বুদ্ধি-বৃত্তির অভাবে কখনও কখনও সে বিষয়টির আসল অবস্থা বুঝা ব্যতিরেকে অনুভূতিহীন অবস্থার শিকার হয়ে যায়। আর এর প্রভাব-সমূহ সারা জীবনের তরে অবশিষ্ট থেকে যায়।

একগুঁয়েমি থেকে বাঁচার জন্যে তার প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিন। অধিকাংশ শিশু অবহেলার (অমনোযোগিতার) কারণে একগুঁয়েমি করে। একগুঁয়েমি করার কারণই হতে দিবেন না। যদি আকাঙ্খা সঠিক ও প্রয়োজনীয় হয় তাহলে তা সত্বর পূর্ণ করে দিন। অন্যথায় তার সন্তুষ্টি অন্যভাবে পূর্ণ করে দিন। যদি নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিশু একগুঁয়েমি করে সফলতা লাভ করে তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে একথা এরূপ কায়দায় মানাবার জন্যে অভ্যস্থ হয়ে যাবে। একজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী পাভলোভ (Pavlov)-এর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, Conditioning অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সময় ধৈর্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ সময় যতই দীর্ঘ হবে ধৈর্যের শক্তি ততই সৃষ্টি হবে। উদাহরণস্বরূপ, ফল ক্রয় করা হয়েছে। শিশু তখনই খেতে চাইবে। শিশুকে বুঝান উচিত যে, ইহা ধৌত করা হবে এবং খাওয়ার পরে, ফল খাওয়া হবে। এভাবে অন্যান্য আবদারসমূহও কখনও সত্বর পুরো করুন কখনও দেরীতে আর কতক আবদার পুরো করবেন না, যেমন 'চাঁদ মামা' এনে দেয়ার আবদার কখনও পূরো হতেই পারে না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, কতক নির্ধারিত জিনিষ শিশুকে দিয়ে দেয়া হোক আর বাকী আবদারগুলোর জন্যে বুঝান যে, ওগুলো কাল পাবে অথবা সন্ধ্যায় পাবে। এ অপেক্ষায় সে ধৈর্য ধারণ করা শিখে যাবে। কখনও তাকে বলা যায় যে, অন্য ভাই বোনেরা স্কুল থেকে আসলে তখন এ জিনিষ দেয়া হবে। এ পদ্ধতিতে সে ধৈর্য ধারণ করতে শিখার সাথে সাথে তার মধ্যে অন্যের সঙ্গে অংশ বন্টন করে নেবার অভ্যেসও গড়ে ওঠবে। মিলে মিশে ভাগ-বন্টন করে খাবার তরবীয়তও সে লাভ করবে।

এতবেশী ধৈর্যের পরীক্ষায়ও শিশুকে ফেলা উচিত নয় যে, তার মধ্যে একগুঁয়েমির সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে 'ব্যক্তিগত মতভেদ'-এর দৃষ্টিভঙ্গি যেন সামনে রাখা হয়। কোন শিশু অধিক সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে পারবে। কেউ সামান্য সময়ের জন্যে, আর কোন অধৈর্যশীল শিশু একগুঁয়েমিও করে ফেলবে।

ক্রোধ সংবরণের অভ্যেস করানোর জন্যে শিশুকে রাগ হবার অবস্থায়ই যেন না ফেলা হয়। একগুঁয়েমি করে কান্নাকাটি করা প্রকৃতপক্ষে ক্রোধের লক্ষণ। একগুঁয়েমি থেকে রক্ষা করার কথা আগেই বলা হয়েছে। এজন্যে ক্রোধ থেকে রক্ষা করা মানে প্রকৃতপক্ষে ঐ অবস্থা সৃষ্টির সুযোগই যেন না দেওয়া হয়। এভাবে কতিপয় নেতিবাচক আবেগের ওপর পরাভব হওয়ার এক পদ্ধতি ইহাই যে, শিশুকে agitated state (উত্তেজিত অবস্থা) থেকে অনবহিত রাখা হোক। উত্তেজিত আবেগসমূকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। এজন্যে উত্তম ইহাই যে, তাকে যেন উত্তপ্ত হতে না দেয়া হয়। নেতিবাচক আবেগসমূহের বিবর্তনের channel (রাস্তা) অন্বেষণ করতে হবে। পরে প্লাবনের ওপরে বাঁধ নির্মাণ করা অসম্ভব না হলেও কঠিন তো অবশ্যই হবে।

সংকল্পবদ্ধ ও সাহসী করার জন্যে ইহা প্রয়োজনীয় যে, শিশুর শিষ্ট কাজ কর্মের পথে বাধা-বিপত্তি যেন সৃষ্টি করা না হয় বরং তাকে সহযোগিতা দেয়া ও পথ প্রদর্শন করা দরকার। যেমন প্রত্যেক শিশুরই সিঁড়িতে চড়বার খুবই শখ থাকে। আর প্রত্যেক মা এ ব্যাপারে ভীত হয়ে যান। যখনই শিশু হামাগুঁড়ি দিতে শুরু করে, সে সিঁড়িতে চড়ে ওপরে উঠতে চায়। কখনও কখনও ব্যথাও পায়। এ সময়ে হাঁকা হাঁকি ডাকা ডাকি এবং ভীতি প্রকাশ করা উচিত নয় বরং সান্ত্বনা দেয়া দরকার। নিজেই রক্ষা করার জন্যে প্রস্তুত থাকা দরকার। পড়ে গেলে আদর করে দেয়া দরকার। অস্থিরতার প্রকাশ তাকে নিরুৎসাহী করে দেবে। শিষ্ট কাজ-কর্মের পথে বাধা-বিপত্তি আরোপের মাধ্যমে ভয়ার্ত করলে শিশু হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়। সমগ্র জীবন টানা পোড়েনের শিকার হয়ে যাবে। ভয়ের অনুভূতি তার ওপরে পরাভব হয়ে যাবে।

অভাবহীন বানানো আর ধৈর্যের প্রেরণা সৃষ্টি করা প্রায় একই কথা। কতক মা শিশুর লোভাতুর চাহনী দূর করাবার জন্যে তাকে পেট পুরে খাওয়াতে চান। কিন্তু এতে লোভ লালসার সৃষ্টি হয়। লালসা ও খারাবি থেকে বাঁচাবার জন্যে ধৈর্যশীলতা শেখানো যথেষ্ট। বর্তমান কালে শিশুর সর্বপ্রকার দাবী পূরো করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এর ফলসমূহের সবটাই নেতিবাচক হয়ে থাকে। শিশুর প্রত্যেক ইচ্ছা পূরণ করার ফলে লোভ লালসা, অধৈর্যশীলতা, পরে একগুঁয়েমিতা, ক্রোধ, ঘৃণার মত দোষসমূহ এথেকে জন্মায়।

শিশুর সব আকাঙ্খা পূর্ণ করার ফলে সে কর্মময় জীবনে বিফল মানুষ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। আর বঞ্চনার অনুভূতির শিকারও। কেননা বাস্তব জগতে এ রকম হয় না যে, যা ইচ্ছে করা হয় তা-ই পূর্ণ হয়। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধা নামক বিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। শত চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও ইহা জরুরী নয় যে, একশ' ভাগ সফলতা লাভ হয়।

এজন্যে শিশুকে শিখতে হবে যে, এ দুনিয়াতে সকল আকাংখা পূর্ণ হয় না। কোন ইচ্ছা পূর্ণ হয় আর কোনটি হয় না। এজন্যে বড়ই প্রজ্ঞার সাথে কাজ করা দরকার যে, শিশু একগুঁয়েমি করলেও ইতিবাচকভাবে তাকে স্বীকার করাতে হবে যে, কখনও কখনও কোন জিনিষ পাওয়াও যায় না।

উপরোল্লিখিত বিষয় বুঝলে পরে স্বল্পে তুষ্টও সৃষ্টি করা যেতে পারে। শিশুকে যা দেবার তা দিয়ে বুঝিয়ে দিন যে, বাস্ তোমার পাওনা এতটুকুই। এথেকে বেশী পাওয়া যাবে না। যখন সে নিজের পাওনার ওপরে সন্তুষ্ট হতে শিখে ফেলবে তখন তার মাঝে ধীরে ধীরে স্বল্পে তুষ্ট হওয়ার অভ্যেসও সৃষ্টি হতে থাকবে।

বিশ্বস্ততা ও সাধুতার গুণ আপাততঃ শিশুর গুণের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও সে শিখতে পারে যে, যখন কোন খেলনা বা কোন জিনিষ তাকে দেয়া হয় যে, এদ্বারা খেলা করো। খেলার পরে তার কাছ থেকে চেয়ে নিন। এই বলে যে, যখন আবার চাইবে তখন পাওয়া

যাবে। দ্বিতীয়বার দিন পুনরায় চেয়ে নিন .....এ পন্থায় সে গচ্ছিত রাখা বস্তু বা নেয়া বস্তু ফেরৎ দিতে শিখে যাবে।

আনুগত্য সৃষ্টি করার জন্যে আবশ্যকীয় যে, আপনার কথাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম দ্বারা মানিয়ে নিন। নচেৎ এ স্তরে আনুগত্যশীল পিতামাতা পাওয়া যাবে কিন্তু শিশু পাওয়া যাবে না। যেমন, শিশু কোন দাবী পেশ করলো তখনই উহাকে পূরণ করে দেয়া হলো। এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। শিশু কর্তৃক প্রয়োজন হোক বা না হোক ছোট ছোট কাজ করান। যেমন, এ জিনিষটি ওখানে রেখে দাও। ঐ জিনিষটি নিয়ে এস। এ জিনিষটিকে ধরবে না। এ ধরনের অনুশীলনের দ্বারা তার মধ্যে কথা মানার অভ্যেস গড়ে ওঠবে।

মন্টিসোরী (Montessori) পদ্ধতির শিক্ষার গুণাবলী নিজেদের আয়ত্বাধীন করতে হবে, আর উহার ত্রুটিগুলো দূর করতে হবে। উপরোক্ত তালীমি, তরবীয়তি, চারিত্রিক ধর্মীয় বিষয়াদির ওপরে প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যাবলীকে.....মন্টি সোরী পদ্ধতির ইতিবাচক শিক্ষা-গুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করে একটি নূতন শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যসূচী তৈরী করতে হবে।

মন্টি সোরী পদ্ধতির শিক্ষার একটি বড় ত্রুটি হলো উহার মৌলিক শিক্ষা পদ্ধতি। উহা এই যে, শিশুদেরকে একেবারে উন্মুক্ত ময়দানে কোন অনুশাসন ও লক্ষ্য ব্যতিরেকে ছেড়ে দেয়া হয়, যেন শিশুর মেধা বিকশিত হয় ও সে যেন আত্ম নির্ভরশীল হয়। কিন্তু এ শিক্ষা পদ্ধতির অন্যান্য গুণাগুণের সাথে সাথে তাদের মধ্যে আনুগত্যের উপাদান সৃষ্টি না হওয়ারই শামেল। সে তার স্বভাবজ চাহিদানুযায়ী স্কুলে সময় কাটায়। তার স্বভাবজ চাহিদাসমূহকে Tame (নিয়ন্ত্রণ) করা হয় না। যদি প্রথমে স্বভাবজ চাহিদাসমূহকে উৎকর্ষ লাভ করার সুযোগ দেয়া হয় আর যদি কোন বিধি নিষেধের বালাই না থাকে তাহলে পরে উহাকে বশে আনা সম্ভব নয়, হলেও বড়ই কষ্টসাধ্য। বলা হয় যে, এ পরিবেশ একে অন্যের ওপরে প্রাধান্য লাভ করার সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু এ বিষয় 'জোর যার মুলুক তার' এর ন্যায় হয়ে যায়। ইহাও ধারণা করা হয় যে, এ পরিবেশ নেতা সৃষ্টি করে। সবাই তো আর নেতা হতে পারে না, যার মধ্যে প্রকৃতিদত্ত প্রবণতা হবে তার যথোপযুক্ত পরিবেশ লাভ হলে তবে সে নেতা হতে পারবে। আর যদি সবাই নেতা বনে যায় তাহলে সবাই 'পাকিস্তানী ষ্টাইলে নেতা' বনে যাবে। বুঝ-পরামর্শ, ক্ষমা, যুগের চাহিদা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে।

স্বভাবজ চাহিদাসমূহের বান ডাকার পূর্বেই আমাদের বাধ্য-বাধ্যকতা আরোপ করতে হবে। ইহাই তরবীয়ত দেবার সময়, কেননা শিশুদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হলে ইতিবাচক বিষয়াদির সাথে সাথে নেতিবাচক বিষয়াদিও গ্রহণ করবে আর তীব্র বেগে এর প্রতি ধাবিত হবে।

ইতিবাচক বিষয়াদি অন্বেষণ করে ওগুলোকে সমুন্নত করতে হবে আর নেতিবাচক বিষয়াদিকে নিরুৎসাহ করতে হবে।

শিক্ষককে বড়ই সাবধানতার সাথে ইহা দেখতে হবে যে, কোন শিশু রাগে লাগামহীন হয়ে যাচ্ছে। তাকে কিছু চাপের মধ্যে রাখতে হবে। কোন শিশু চাপের শিকার হচ্ছে তাকে উদ্দীপ্ত করতে হবে আর উৎসাহিত করতে হবে।

প্রত্যেক শিশুর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি দিয়ে তার মানসিক যোগ্যতা ও শারীরিক শক্তিকে তার সামর্থ্যানুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। আই, কিউ (বুদ্ধিমত্তা) পরীক্ষা করা ব্যতিরেকেও পর্যবেক্ষণ থেকে অবহিত হওয়া যায়। যখন শিশু ক্লাসে থাকে অথবা খেলতে থাকে তখন কোন শিশুর মধ্যে কি কি যোগ্যতা তা দৃশ্যমান হয়। প্রত্যেক শিশুর ব্যাপারে রেকর্ড রাখুন আর পুনরায় সাথে সাথে তার ঝোঁক, তার উন্নতি, তার মধ্যে কম ও বেশী আর উহাদের কারণসমূহ সম্বন্ধেও অবহিত হতে রেকর্ড রাখা দরকার।

পারতপক্ষে 'মা' যেন শিক্ষক না হন, যেন তিনি Objectively (নিরপেক্ষভাবে) পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেছিলেন যে, মা তার নিজ সন্তানের জন্যে যতটুকু স্নেহশীল হন অন্যান্য শিশুদের জন্যে ততটুকু ছিদ্রান্বেষী হয়ে থাকেন।

সবচে' প্রয়োজনীয় বিষয় হলো দোয়া। পিতামাতা প্রতি মুহূর্তে সন্তানের ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণের জন্যে দোয়া করতে থাকুন। দোয়া দ্বারা অন্তরগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব। খোদাতা'লা ঐ খোদার পথে ওয়াকফ কৃত বাহিনীকে ঐসব পরিকল্পনাসমূহ থেকে বেশী বেশী করে উপকৃত হতে সুযোগ দিন যা এখন জামাতে আহমদীয়ার সম্মানিত ইমামের মনে আছে। আমীন আল্লাহুম্মা আমীন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবাসমূহের আলোকে ওয়াকফীনে নও শিশুদের তরবীয়তের ব্যাপারে কতিপয় অতিরিক্ত জরুরী পথ-নির্দেশনা

- নেযামে জামা'ত আর জামাতী কর্মকর্তাগণের প্রতি সম্মান করতে শিখান।
- অভ্যন্তরীণ সংগঠনসমূহ যেমন, আতফাল, নাসেরাত ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করান।
- সত্যতার প্রতি অনুরাগ এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করান।
- তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততার উপাদান সৃষ্টি করুন।
- ক্রোধ সংবরণ করার অভ্যেস গড়ে তুলুন।
- মেযাজের মধ্যে সজীবতা এবং সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করুন।
- প্রত্যেক কথার জবাব বুঝে শুনে দেবার অভ্যেস সৃষ্টি করুন।
- জ্ঞান শিক্ষা করার প্রেরণা সৃষ্টি করুন।
- জ্ঞানকে ব্যাপকতা দেবার জন্যে উত্তম সাময়িকী, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পাঠের অভ্যেস সৃষ্টি করুন।
- অবশ্যই উর্দু আর আরবী ভাষা শিখান।
- হিসাব কিতাব রক্ষণাবেক্ষণের অভ্যেস গড়ে তুলুন এবং তরবীয়ত দিন।
- ওয়াকফে নও শিশুদেরকে যথাসময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বি এড ও এম, এড অথবা চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিন।

সংবাদ

উত্তর মেরুতে মসজিদ নির্মাণ

হুযূর (আইঃ) উত্তর মেরুর দুরবর্তী স্থান NORD KAPP-এ গত ২৫শে জুন, ১৯৯৩ সনে একটি ঐতিহাসিক খুতবা প্রদান করেন। হুযূর (আইঃ) এই এলাকাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ হতে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন আর ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"আমি যতদূর জানি তার পরিপ্রেক্ষিতে এমন কোন সম্ভাবনা নেই যে, আজ হতে পূর্বে এমন জায়গায় যেখানে ছয় মাসে দিন অথবা দিন চব্বিশ ঘন্টার বেশী সেখানে কখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক জায়গায় বাজামাত আদায় করা হয়েছে, অথবা জুমুআ এভাবে বাজামাত আদায় করা হয়েছে যে, উম্মতে মুসলেমার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ আনসার বয়সের লোক, খোদ্দাম বয়সের লোক, বাচ্চা, পুরুষ মহিলারা এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত। আমার অনুমান অনুযায়ী এই ঘটনাটি সর্বপ্রথম ঘটতে যাচ্ছে যে, হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উম্মতের এই ব্যতিক্রমধর্মী সময়ের অঞ্চলে রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আর এই এবাদত গতকাল হতে শুরু হয়েছে। গতকাল আমরা মাগরেব ও এশার নামায এখানে আদায় করেছি এবং তারপর এখানেই অবস্থান করেছি। পরবর্তীতে আমাদের অনুমান সকালের সময়ে ফজরের নামায আদায় করে আমাদের স্থায়ী ক্যাম্প-এর দিকে চলে যাই। এখন আবার আমরা জুমুআর জন্যে একত্রিত হয়েছি। এখানে জুমুআর সাথে আসরের নামাযও পড়া হবে। এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এভাবে পড়া হয়েছে যে, এতে পুরুষ মহিলা এবং বাচ্চারা অংশগ্রহণ করেছে। সকল শ্রেণীর মানুষ খোদার ফযলে এ নামাযে শামিল। এদিক হতে এক ঐতিহাসিক জুমুআ যা প্রথমবার এমন ব্যতিক্রমধর্মী অঞ্চলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে জুমুআর নামায আদায় করছি"।

হুযূর (আইঃ)-এর তরফ হতে নতুন মসজিদের নির্মাণের ঘোষণার সাথে সাথে কাফেলার সদস্যগণ নিজেদের তরফ হতে এক হাজার পাউণ্ড দিবার অঙ্গীকার করেছেন। আর হুযূর (আইঃ) নিজের ও নিজ সদস্যদের তরফ হতে দ্বিতীয় ওয়াদা এক হাজার পাউণ্ড এর অঙ্গীকার করেছেন। এখন খোদার ফযলে এ অঞ্চলের মসজিদ নির্মাণের জন্যে জমি নেয়া হয়েছে। আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আইঃ)-এর গত ৭ই অক্টোবরের খুতবায় এ মসজিদের নির্মাণের জন্যে মালী কুরবানীর ঘোষণা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে হুযূর (আইঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই তাহরীকের সরাসরি সম্বোধনকারী জামাত হলো নরওয়ের জামাত। কিন্তু যেহেতু ইহা এক ঐতিহাসিক ঘটনা অন্যান্য দেশের বন্ধুগণ এই তাহরীকে

অংশগ্রহণ করলে ঐতিহাসিক সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। সুতরাং জামাতের যে সকল বন্ধু এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের ওয়াদা ও নামের তালিকা ওকালাতে মাল লণ্ডনে প্রেরণ করে কৃতার্থ হবেন।

এডিশনাল ওকীলুল মাল

নোট: সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি এবং এ মহান কাজে সকলকে সাধ্যমত শামেল হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক আল-ফযল

যেসব বন্ধু ইন্টারন্যাশনাল উইকলি আল ফযলের গ্রাহক হতে চান তাদেকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সাথে সত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মকবুল আহমদ খান
সেক্রেটারী পাবলিকেশন
ও
নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য়

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্তা

বার্ষিক ইজতেমা ঃ

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ৫ ও ৬ই নভেম্বর '৯৩ বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ইজতেমা সফলতার সাথে সুসম্পন্ন হয়েছে। ইজতেমা ৪টি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সদর সাহেব। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন নাযের, ইসলাহ ও ইরশাদ, মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। এই অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মোহতরম নাযের সাহেব ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব যথাক্রমে আনসারুল্লাহ্‌র পতাকা ও বাংলাদেশ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাংগণে।

কায়েদ উমুমী ১৯৯৩ সালের বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র কার্যবিবরণী (রিপোর্ট) পেশ করেন এবং অর্থ রিপোর্ট পেশ করেন কায়েদ মাল জনাব কাশেম আলী খান সাহেব। বিশেষ অতিথি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযূর (আঃ)-এর তাহরীক অনুযায়ী অধিক হতে অধিকতর সংখ্যায় নূতন বয়াতকারী ভাইগণের তালীম তরবীয়তি এবং আগামী

বৎসরের বয়াতের টার্গেট অর্জণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মোহতরম সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব প্রধান অতিথির ভাষণে তালীম, তরবীয়ত, তবলীগ, মালী কুরবানী করার জন্য আনসারগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে সদর মজলিস আনসারুল্লাহ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব তাঁহার ভাষণে মালী কুরবানী উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ভিজির আলী সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ম। এই অধিবেশনে প্রথম বক্তব্য পেশ করেন নেযামে ওসীয়্যতের উপর জনাব এ,কে, রেজাউল করীম সাহেব, সেক্রেটারী ওসীয়্যত, দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া জামাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর উপর মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী, তৃতীয় বক্তব্য পেশ করেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর আসল রূপ এর উপর মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩য়। ৩ জন নূতন বয়াতকারী "আমি কেন আহমদী হলাম" এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন।

তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩য়। এই অধিবেশনের প্রথম বক্তা ছিলেন মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী। বক্তব্যের বিষয় ছিল "এতায়াতে নেযাম"। দ্বিতীয় বক্তা মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী। তাঁহার বক্তব্যের বিষয় ছিল "যিকরে হাবিব"। তৃতীয় বক্তা ছিলেন জনাব আলহাজ্জ তবারক আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। তাঁহার বক্তব্যের বিষয় ছিল "হযরত আমীরুল মোমেনীনের সাম্প্রতিক তাহরীকাতের গুরুত্ব (তবলীগ, তালীম ও তরবীয়ত)। এই অধিবেশনের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় ছিল "বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশ্ন-উত্তরের প্রতিযোগিতা"।

শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব ও বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। ন্যাশনাল আমীর সাহেব আনসার-গণকে জামাতের পরিচালিকা শক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে মোহতরম সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব প্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়। এই ১৬তম ইজতেমায় ৫০টি মজলিস হইতে আনসারগণ যোগদান করেন।

মজলিসে শূরা ঃ

এই বৎসরের শূরা আমাদের মজলিসে আনসারুল্লাহুর প্রকৃত রূপ খুলে দিয়েছে। শূরায় সর্বমোট উপস্থিত ছিল ১৬৯ জন আনসার, তন্মধ্যে ৭৭ জন সদস্য (২৭ জন

যয়ীমে-আলা ও যয়ীম ৩৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি বিভিন্ন মজলিস থেকে এবং ১২ জন মেম্বর মজলিসে আমেলা) ৯২ জন ছিল দর্শক।

৮ম তালিমুল কুরআন ক্লাস ঃ

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর তালীমুল কুরআন ক্লাস ৮-১১-৯৩ হতে ১২-১১-৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন ক্লাসের প্রথম দিন অর্থাৎ ৮-১১-৯৩ তারিখে সদর জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব কুরআন শিক্ষার উপর অতি উচ্চাঙ্গের বক্তব্য রাখেন। এই কুরআন ক্লাশে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া হয় ঃ

(১) তরজমা ও অর্থসহ পবিত্র কুরআন ৬ষ্ঠ পারা ও শেষ ২০ টি সূরা (২) অর্থসহ নামায ও দীনি মালুমাত (৩) তবলীগ, মালী কুরবানী, তরবীয়ত ও সাংগঠনিক আলোচনা (৪) বক্তৃতা শিক্ষা (৫) ইলমী মোযাকেরা। এই বিষয়গুলি ব্যতীত ৪টি কিতাব যথা :— (ক) ইসলামী নীতিদর্শন (খ) তাজকিরাতুশ শাহাদাতাইন (গ) কিশ্‌তিয়ে নূহ (ঘ) সীরাতে সুলতানুল কলম এর উপর আলোচনা হয়। এই ক্লাসগুলির মধ্যে শিক্ষকতা করেন সর্বজনাব মাওলানা আবদুল আওওয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী, মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, ডাঃ আবদুল আজিজ, ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, সদর, মজলিস জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া, মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী ও জনাব এ, কে, রেজাউল করীম। কুরআন ক্লাসের সমাপ্তি অধিবেশন হয় ১২-১১-৯৩ তারিখ বাদ জুমুআ। সভাপতিত্ব করেন জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া, সদর মজলিস এবং প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতরম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর। অতঃপর আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

আবদুল কাদের ভুঁইয়া
জেনারেল সেক্রেটারী, বাঃ মঃ আঃ
ও সেক্রেটারী তালীমুল কুরআন ক্লাস ও ইজতেমা কমিটি

সন্তান লাভ

ঘাটুরা মজলিসের জনাব মোহম্মদ মোছা মিয়াকে আল্লাহ্‌তা'লা ৬/১১/৯৩ইং তারিখ রোজ শনিবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌তা'লা যেন তার সন্তানকে দীর্ঘ আয়ু দান করেন এজন্যে সকল ভাই ও বোনের

নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

এস, এম সেলিম, মোতামাদ
মঃ খোঃ আঃ, ঘাটুরা

দোয়ার আবেদন

আমি বেশ কিছু দিন হতে জ্বর, সর্দি ও কাশিতে ভুগছি। জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি। সেই সাথে আমার পরিবারের সকলের জন্য দোয়ার আবেদন রইল।

হোসেন আহমদ
মোয়াল্লেম।

রেডিওতে হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা শুনুন

২৯শে অক্টোবর, ১৯৯৩ থেকে আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমা'র খুতবা রেডিও তে শর্ট ওয়েভ ২৫ মিটার ব্যাণ্ডে লণ্ডন সময় ১-৩০মিঃ ও বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় প্রচারিত হচ্ছে। আপনি ও আপনার জামাতের সদস্যগণ এই খুতবা শুনার ব্যবস্থা করুন আর প্রত্যেক রবিবার অনুগ্রহপূর্বক নিম্নবর্ণিত ছকে খাকসারের দপ্তরে একটি রিপোর্ট পাঠান।

এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,
বাংলাদেশ

প্রতিঃ জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্টগণ

জামাতের নাম	:	
খুতবার তারিখ	:	
রেডিও সেটের নাম	:	ফিলিপ্স/ন্যাশনাল/সনি/সার্প/ (অর্থাৎ কি সেট?)
কত ব্যাণ্ডের	:	২ ব্যাণ্ড/৩ ব্যাণ্ড/৪ ব্যাণ্ড
খুতবা কতক্ষণ শুনেছেন	:	পুরো/.....মিনিট
আওয়াজ কিরূপ?	:	পরিষ্কার/অস্পষ্ট/কাটাকাটা/হিজিবিজি

(যা সঠিক তার উপরে টিক চিহ্ন দিন)

দস্তখত—
আমীর/প্রেসিডেন্ট
আঃ মুঃ জাঃ.....
তারিখ.....

সংবাদ

কাসরে সলীব পাবলিকেশনের ত্রিশ বৎসর এবং ঋতু পত্রের বিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২৬/১১/৯৩ তারিখ বাদ জুমুআ দারুত তবলীগে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মুহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব (ন্যাশনাল আমীর) জনাব আবদুল হাদী, মৌলানা আবদুল আওওয়াল খান চৌধুরী এবং অধ্যাপক ডঃ মুজাহিদ উদ্দীন আহমদকে ঋতুপত্র পদক প্রদান করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা সংগঠক, প্রচার কার্য এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য যথাক্রমে এই পদক প্রদান করা হয়। পদক প্রদানকালে প্রায় আড়াইশত ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সব শেষে ইজতেমায়ী দোয়া করা হয়।

উল্লেখ্য যে, পূর্বদিন অর্থাৎ ২৫/১১/৯৩ রাতে এই উপলক্ষে এক প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়। মুহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব সহ বেশ কিছু সুধী ব্যক্তি উক্ত নৈশ ভোজে অংশ গ্রহণ করেন।

এও উল্লেখযোগ্য যে, পাঁচ বৎসর পূর্বেও অনুরূপভাবে ছয় জন কৃতী পুরুষকে 'ঋতুপত্র পদক' প্রদান করা হয়েছিল।

আহমদ তবশির চৌধুরী
এসিসটেন্ট সেক্রেটারী তবলীগ,
আঃ মুঃ জামাত, বাংলাদেশ

বিদায় সংবর্ধনা ও অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান

গত ১২/১১/৯৩ইং রোজ শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকায় কার্তিকের পরন্ত বিকেলে বি, বাড়ীয়া মজলিসের সাবেক কায়েদ জনাব গোলাম কাদের সাহেব ও নতুন কায়েদ জনাব শাহ্জাদা খানের বি, বাড়িয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরফ থেকে যথাক্রমে বিদায় সংবর্ধনা ও অভ্যর্থনা দান করা হয়।

মোঃ ময়নুল ইসলাম ভূঞা
মোতামাদ

বিশেষ সভা

আল্লাহ্তা'লার ফযলে গত ৩১/১০/৯৩ইং হুযূর (আইঃ)-এর বিশেষ প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেবের শুভ আগমন উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুমিল্লায় এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত সভায় ৭৩ জন পুরুষ, ৬৪ জন মহিলা এবং ৭জন অ-আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ এম, এ, আযীয
প্রেসিডেন্ট

নব নির্বাচিত সদরের দোয়ার আবেদন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর সকল সদস্যের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, হযরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ এই দুই সালের জন্যে খাকসারকে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর হিসেবে অনুমোদন দান করেছেন, আল্ হামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, হুযূর আকদাস (আইঃ)-এর সদয় অনুমোদন লাভের পর সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর নবগঠিত মজলিসে আমেলার নাম পাঠানো হবে, ইনশাল্লাহ্। বন্ধুগণের নিকট খাস দোয়ার জন্যে আবেদন করা যাচ্ছে যেন আল্লাহ্-তা'লা এই নিযুক্তিকে সবদিক থেকে সিলসিলার জন্যে বা-বরকত করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার তৌফীক দান করেন।

অনুগ্রহ করে নব-উদ্যমে ও নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করুন, যাতে গোটা দুনিয়ার সামনে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ হুযূর (আইঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী একটি আদর্শ ও দৃষ্টান্তমূলক মজলিসে পরিণত হতে পারে।

কে, এম, মাহমুদুল হাসান
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

সন্তান তাওয়াল্লাদ

পরম করুণাময়ের দরবারে অফুরন্ত শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে গত ১৯-৯-৯৩ইং একজন কন্যা সন্তান দান করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের আরো দুই সন্তান তারেক আহমদ ও আমাতুল হাফিযের ন্যায় হুযূর (আইঃ) এই সন্তানটিকেও ওয়াকফে নও স্কীমে গ্রহণ করিয়াছেন, আলহামদুলিল্লাহ। হুযূর (আইঃ) এই সন্তানের নাম রাখিয়াছেন হুব্বাতুল ওয়াহিদ।

আল্লাহ্তা'লা যেন আমাদের এই সন্তানদিগকে উত্তমরূপে তালীম তরবীয়তের মাধ্যমে দীনি খেদমতের জন্য জামা'তের নিকট পেশ করার তৌফিক দান করেন এজন্য জামাতের বুযূর্গ ও বন্ধুগণের নিকট খাসভাবে দোয়ার আরয করছি।

মাহমুদ আহমদ শরীফ
মোয়াল্লেম

শোক সংবাদ

আমার আম্মা আবেদা বেগম, স্বামী মরহুম খলিলুর রহমান খাদেম গত ১৫-১১-৯৩ তারিখ রাত্র ৯টার সময় খড়মপুরে আমার ছোট বোনের বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

তাঁর রূহের মাগফেরাত, দারাজাতের বুলন্দী এবং আমরা যাতে এ শোক কাটিয়ে উঠতে পারি সেজন্যে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

উল্লেখ্য, এ মহিয়সী মহিলা জার্মানী বার্লিন নগরীতে প্রথম আহমদী মসজিদ নির্মাণের সময় তদানীন্তন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) চাঁদার আহ্বান করলে আমাদের মরহুমা আম্মাজান আবেদা বেগম হযরত সাহেবের সেই নেক আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর নিজের সমুদয় অলংকারাদি এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি উক্ত মসজিদ নির্মাণ কল্পে দান করেছিলেন। এ বিষয়টি আমাদের শ্রদ্ধেয় চাচাজান মরহুম খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী সাহেব ও শ্রদ্ধেয়া মরহুমা চাচীজানও ভালভাবে অবগত ছিলেন।

মোবারেকা বেগম, বগুড়া

(৪৫ পাতার পর)

সুযোগ পেয়েছি তাতে দেখছি যে, আমরা খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী তো নইই বরং 'খতমে নবুওয়তে'র উপর দৃঢ় বিশ্বাসী, আরবী অভিধান ও বাগধারা অনুযায়ী এর যত প্রকার অর্থ হতে পারে সেই সকল অর্থেই। বুযুর্গানেদীনও খতমে নবুওয়তের যে অর্থ করেছেন আমরাও সেই অর্থ করে থাকি। খতমে নবুওয়তের ব্যাপারে জামাতে আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন যখন সেদিকে দৃষ্টিপাত করলাম তখন দেখলাম, তিনি বলেছেন :

(ক) "আমি জনাব খাতামাল আম্বীয়া (সাঃ)-এর 'খতমে নবুওয়তে' বিশ্বাসী এবং 'খতমে নবুওয়তে' যে অবিশ্বাসী তাকে বেদীন এবং তাকে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করি।" (বক্তৃতা, ওয়াযেবুল এলান, ৫ পৃষ্ঠা, ১৯৯১ সনে মুদ্রিত)।

(খ) আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এই যে, আমাদের রসূল (সাঃ) রসূলগণের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং রসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম এবং খাতামান্নবীঈন। এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম যিনি আগামীতে আবির্ভূত হবেন বা অতীতে আবির্ভূত হয়েছেন (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম ৩৪৭ পৃষ্ঠা, ১৮৯২ সনে মুদ্রিত)।

এ ছাড়াও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) তাঁর বিভিন্ন কিতাবাদি এবং বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের যা শিখিয়েছেন তাতে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করি যে, আমরা খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী নই। বয়াতের শর্ত হিসেবেও আমাদের এই আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস আমরা একশ' বছরের অধিক সময় ধরে ঘোষণা করে আসছি। তবুও আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ আমাদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া লাগাচ্ছেন, সম্মেলন-মহা সম্মেলন ডেকে আমাদেরকে 'অমুসলমান' ঘোষণা করার পাঁয়তারা করছেন। নানা প্রকার ফেতনা ফাসাদের ইন্ধন যোগাচ্ছেন।

আমরা আমাদের এই ভাইদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সত্য এবং মিথ্যার ফয়সালা আইন পাশ করে হয় না। তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে যারা আইন পাশ করে সত্যকে মিথ্যা বানানোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাদের পরিণতির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি যেমন আপনারা চান, তেমনি আমরাও। আপনাদের নিকট আমাদের তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ, এসব পথ অনুসরণ করে সত্য মিথ্যা যাচাই হবে না—কোন দিন হয় নি। চোখ রাঙ্গিয়ে আহ্‌মদীয়াতকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়া যাবে না, যদি তা করা যেত, তা হলে একশ' বছরের অধিক সময় ধরে এ ক্ষুদ্র জামা'ত দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে পারত না। বরং আসুন আপনারা দোয়া করুন খোদার দরবারে এবং আমরাও দোয়া করি। আল্লাহ্‌তা'লা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবেন কারা সত্যিকারভাবে খতমে নবুওয়তের উপর বিশ্বাসী এবং কারা এর অস্বীকারকারী। আল্লাহ্‌তা'লার সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন এই কামনা করি।

সম্পাদকীয় :

আত্ম-জিজ্ঞাসা

কয়েক যুগ পূর্বে এই পবিত্র সিলসিলায় দাখেল হয়েছি তখন থেকেই একটা প্রশ্ন বারে বারে মনে দোলা দিচ্ছে—বিরুদ্ধবাদীরা কেন আমাদের বিরোধিতা করছে। এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী (আঃ)-এর বিরোধিতা হয়েছে, তার কারণ কি ছিল? সে যুগে নবীগণ (আঃ) এসে সমসাময়িক সমাজকে নতুন শিক্ষার দিকে আহ্বান করেছেন, আবার কেউ কেউ নতুন বিধানও দিয়েছেন, ঐ যুগের দেব-দেবী বা মিথ্যা উপাস্যদেরকে পূজা করতে বারণ করেছেন। তাই সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আহমদীয়ত আমাদেরকে কোন নতুন শিক্ষা দেয়নি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক আনীত সেই মৌলিক শিক্ষার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আমাদের কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।" আমরা ইসলামের ৫টি স্তম্ভ যেমন কলেমা, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রোযার উপর বিশ্বাসী। এগুলোর উপর আমরা পরিপূর্ণভাবে আমল করার চেষ্টা করি। আমরা কুরআন, সুন্নাহ এবং হাদীসের পুরাপুরি পাবন্দ। তদুপরি আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে এক ব্যক্তিকে, আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের কাছে যাঁর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইমাম মাহ্দী হিসেবে মান্য করেছি। তিনি যদি (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা হন তাহলে আমাদের ক্ষতি কি? আমরা তো আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথেই কায়েম রয়েছি। যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায় যে, ইমাম মাহ্দী (আঃ) এখনও আসেন নি, আরও পরে আসবেন। তাহলে আমরাই তখন তাঁকে আগে গ্রহণ করবো; কেননা আমরা মানতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই মাহ্দী যদি সত্য-মাহ্দীই হন (আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিবেক অনুযায়ী তিনি সত্য), তাহলে যারা বিরোধিতা করে তাঁকে মানছেন না তাদের কি গতি হবে। আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আমাদের বিরোধের কোন হেতু নেই। আমরা তাদের সবচে' বেশী হিতাকাঙ্খী। কেননা, তারাও আমাদেরই মত রসূল (সাঃ)-এর উম্মত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা তা বুঝেন না।

তাদের বিরোধিতার কথা যখন গভীরভাবে চিন্তা করে একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম তখন মনে হল, ভুল বুঝা বুঝির কারণে হয়তবা সেটাই বিরোধিতার কারণ হতে পারে—আর সেটা হল 'খতমে নবুওয়ত'। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ সচরাচর আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে থাকেন যে, আমরা নাকি 'খতমে নবুওতের' অস্বীকারকারী। আমাদের বিরুদ্ধে একথা বলা হয় যে, আমরা নাকি হুযুর (সাঃ)-এর খতমে নবুওয়তে ভাগ বসিয়েছি এবং নবুওয়তে শির্ক করেছি, যা প্রকৃতপক্ষে হাস্যাস্পদ অথচ যতটুকু নিকট থেকে দেখার

(অবশিষ্টাংশ ৪৪ পাতায় দেখুন)

আহ্‌মদী

30th November, 1993

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীঅত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury